সেগুলো ডুবাইয়া বাড়ী ফিরিয়া দেখিল পিতা স্নানান্তে গায়ত্রী জপ করিতেছেন।

কাপড়গুলো বারাণ্ডার একপাশে ফেলিয়া রাখিয়া সে ত্রস্তপদে আহারের উদ্যোগে চলিয়া গেল!

পিতাকে আহারে বসাইয়া সে চুপ করিয়া কাছে বসিয়া রহিল, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। হৃদয় যাহা অনুভবে জানিতে পারিয়াছে, তাহা স্পষ্ট যেন কানে শুনিতে পারা যায় না।

আহার করিতে করিতে হরগোবিন্দ বলিলেন, "আজ যে আমি আসব—তা কি জানতে পেরেছিলি দয়া?"

দয়া বলিল, "তুমি তো বলেই গেছলে বাবা।"

"বলে গেছলুম—? কিন্তু আমার তো মনে নেই তা—"

বলিয়া হরগোবিন্দ আবার আহার করিতে লাগিলেন।

দয়া বলিল "আজ সারাদিন জলস্পর্শও করনি বাবা?"

হরগোবিন্দ নীরবে মাথা নাড়িলেন। দয়া আর কোনও কথা না বলিয়া পিতার জন্য আনীত দুধে বাতাস করিতে লাগিল।

হরগোবিন্দ বলিলেন "এত কথা জিজ্ঞাসা করলি দয়া, তার কথা একবার জিজ্ঞাসা করলি নে—যাকে আনতে গেলু আবার রিক্ত হস্তেই ফিরে এলুম?"

রুদ্ধ কণ্ঠে দয়া বলিল "জিজ্ঞাসা করলে যা উত্তর পেতুম বাবা, তা তোমার মুখে চোখেই তো ফুটে উঠেছে।"

কণ্ঠ একেবারেই রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, ঝাড়িয়া ফেলিয়া হরগোবিন্দ বলিলেন "তবু—তবু জিজ্ঞাসা করলিনে দয়া সে কেন এলনা—সে কি বলে তার বুড়ো বাপকে ফিরিয়ে দিলে,—কি আঘাত দিয়ে বুড়ো বাপের বুকখানাকে ভেঙ্গে দিলে?

তাঁহার কণ্ঠ কাঁপিতে লাগিল, তিনি তাড়াতাড়ি মুখ নত করিয়া ফেলিলেন কারণ চোখ দুটিও বোধ হয় জলে ভরিয়া আসিতেছিল।

দয়ার চোখও শুষ্ক ছিল না, সে ক্ষিপ্রহস্তে সে ধারা মুছিয়া ফেলিয়া বলিল "কি জিজ্ঞাসা করব বাবা! আমি তো আগেই একথা বলেছিলাম বাবা, আগেই তো শুনেছিলে এ রকম ঘটতে পারে, তবু কেন বাবা, সে কথা অগ্রাহ্য করে তুমি ছুটলে? এ রকম ঘটা তো বিচিত্র নয়, এ যে জ্বলন্ত সত্য কথা তুমি—"

বাধা দিয়া তেমনি রুদ্ধকণ্ঠে হরগোবিন্দ বলিলেন, "স্নেহ—মা স্নেহ। আমায় পরাজিত করেছে এই দুরন্ত পুত্রস্নেহ। ওরে পাগলি, তুই কি জানবি, সে কি জিনিষ। তুই তো মা হোসনি দয়া, মেয়ে হয়েই আছিস্। যদি মা হতিস, জানতে পারতিস সন্তানস্নেহ কি? যদি তোদের মা থাকত তবে—তবে আমায় তো এ জ্বালা সইতে হোত না। এ যন্ত্রণা সম্পূর্ণ

সহ্য করত সেই, আমার তো কিছুই হোত না দয়া। সে যে চলে গেছে, ছোট ছোট ছেলে মেয়ে দুটিকে দিয়ে গেছে আমার হাতে। আমি তো শুধু বাপের স্নেহই দেই নি তোদের, তোরা যে মায়ের স্নেহও লুটে নেছিস আমার কাছ হতে! জানিস নি তো মা—সেই দিনটার কথা—সতী সাধ্বী মা তোর এই উঠানে শুয়ে, এক বছরের মেয়ে তুই—কেঁদে লুটোপুটী খাচ্ছিস, তিন বছরের ছেলে প্রমোদ, হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে, বড় বড় চোখ বেয়ে তার জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে তার বুকখানা ভাসিয়ে যাচ্ছে—দয়া, সে দিনের কথা ভুলতে পারব কি মা?

ঝর ঝর করিয়া, বৃদ্ধের কোটরগত চক্ষু কোণ বহিয়া জল পড়িতে লাগিল।

দয়া বলিল—"বাবা—খেতে বসে—"

হরগোবিন্দ বাম হাতে চোখ মুছিয়া বলিলেন "খাচ্ছি মা, খাওয়া তো আছেই, এ তো যাবে না। বড় আঘাত পেয়েছি দয়া, আজ প্রাণে বড় লেগেছে। যদি এই কথাগুলো না বল্‌তে দিস আমি দম ফেটে মরে যাব। আমায় বলতে দে দয়া, আমার কথাগুলো শেষ করতে দে। আচ্ছা দয়া, সত্যি বল দেখি মা—আমি তোদের যতটা ভালবাসি, তোরা কি আমায় ততটা ভালবাসিস?"

দয়া চোখ মুছিতে মুছিতে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "বাসি বাবা।"

মাথা নাড়িয়া হরগোবিন্দ বলিলেন "না, তা নয় মা। স্নেহ

নদীর জলের মত হয় নিম্নগামী, উর্দ্ধগামী কখনই হতে পারে না। যদি তা হোত, তবে সেই প্রমোদ, যাকে এত করে মানুষ করলুম—সে—সে কিনা মা আমার সঙ্গে একবার দেখাটী করলে না। শুনলুম অসুখ—তাই গেলুম মা, কিন্তু সে বলে পাঠালে দেখা করবার সময় নেই। ওরে সন্তান, ওরে রাক্ষস, খেতে এসেছিস তোরা, খেয়ে যা! সাধ্বী সতী পুন্যবতী বড় ভাগ্যে মরতে পেরেছে, আমি কেন মরতে পারলুম না, আমি কেন বেঁচে থেকে এই যন্ত্রনা সহ্য করছি ?"

বৃদ্ধ চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে উঠিয়া পড়িলেন, দয়া বলিয়া উঠিল "খেলেন না বাবা, সবই যে পড়ে রইল।"

হরগোবিন্দ বলিলেন "বড় পেট ভরে গেছে দয়া, আর খেতে পারছি নে।"

"আ আমার পোড়াকপাল রে, সারাদিন জলস্পর্শ ইস্তক করনি ; দুটো ভাত খেতে বসে কেবল চোখের জল ফেলেই উঠলে বাবা ?

চোখ মুছিয়া দয়া পিতাকে আলো ধরিতে গেল।

দুই

সে আজ অনেক দিনের কথা যে দিন প্রমোদ গ্রাম হইতে কোনও মতে মাইনর পাস করিয়া কলিকাতায় পড়িতে গিয়াছিল। সে খুব মেধাবী ছেলে ছিল, মাইনর পাস করিতে তাহার একটুও দেরী হয় নাই।

হরগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য যাজক ব্রাহ্মণ, গ্রামে অনেক যজমান নিষ্ঠাবান পুরোহিতকে সকলেই বড় ভালবাসিত। এ পর্য্যন্ত নিজের চরিত্রের বিশুদ্ধতা তিনি কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত করিয়া পালন করিয়া আসিতেছেন। প্রকৃত নিষ্ঠাবান হিন্দু বুঝাইলে যাহা বুঝায় তিনি তাহাই ছিলেন।

প্রমোদকে তাঁহারই এক যজমান ইংরাজি পড়াইতে কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে পিতার প্রথমে বিশেষ আপত্তি ছিল; পুত্র যে বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়া যাইবে, তাঁহার মতে আর চলিবে না ইহাই তিনি নিশ্চিত জানিতেন। তাঁহার যজমান তাঁহাকে বুঝাইলেন প্রমোদ যেরূপ তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন ছেলে তাহাতে সে লেখাপড়ায় খুব ভাল হইতে পারিবে এবং কালে সে একটা মানুষ হইয়া যাইবে। আর ইংরাজি লেখাপড়া শিখিলেই যে মানুষ বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়া যায় এমন কোনও কথা নাই। তিনি অনেক প্রমাণ দেখাইতে পারেন যাহাতে পিতার মনের সকল সন্দেহ ঘুচিয়া যাইবে।

পুত্রের উন্নতির আশায় পিতা তাহাকে কলিকাতা যাইতে দিলেন। প্রতি বৎসরই প্রমোদ ছুটির সময় বাড়ী আসিত, পিতা ও ভগিনীর প্রতি তাঁহার মমতা অক্ষুণ্ণ ছিল। এইরূপে সে বি-এ পাশ করিল।

একদিন হঠাৎ হরগোবিন্দের কাণে ভাসিয়া আসিল তাঁহার প্রমোদ বিলাতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, তাহার এক ধনী বন্ধু অযাচিত ভাবে দয়া করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া বিলাত যাইতেছেন।

সদ্যবিধবা দয়া তখন পিতার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহাকে একা রাখিয়াই পিতা রুদ্ধশ্বাসে কলিকাতায় ছুটিলেন। যদি কোনও ক্রমে তাহাকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিতে পারেন, ভালবাসার শেষকথায় যদি সে গৃহে আটক থাকে।

কিন্তু হায় তিনি যখন গিয়া পৌঁছিলেন তাহার এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই প্রমোদ বিলাত রওনা হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ যে মুখে গেলেন, সেই মুখেই ফিরিয়া আসিলেন। যজমান মণি মিত্রের কাছে গিয়া আছড়াইয়া পড়িলেন—"তুমি আমার এ কি করলে মণি? কেবল তোমার কথাতেই আমি যে ছেলেকে কলকাতায় পড়তে দিলুম। আমার ছেলেকে ফিরে এনে দাও, নচেৎ আমি তোমার দুয়ারে আত্মহত্যা করে মরব!"

মণি মিত্র তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন “বিলেত গেছে এতে আপনার এত ভাবনা করা অন্যায়। সে ছোট ছেলে নয় যে নিজের ভাল মন্দ বুঝতে পারবে না! সে বুঝেছে বিলেতে গেলে একটা বড়লোক হয়ে আসতে পারবে, তাই গেছে!”

হরগোবিন্দ বলিলেন “কেন, এখানে থেকে কি বড়লোক হওয়া যায় না?”

মণি মিত্র বলিলেন “এখানে থেকে বড়লোক হওয়া? আপনি যে একেবারে অবাক করলেন পুরুত ঠাকুর মশাই। ভারতের শিক্ষা কি শিক্ষাবলে গণ্য হতে পারে? দেখুন একই পড়া, এখানে পড়লে এক, আর বিলেতে পড়লে এক! আপনার ছেলে, যে ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলেত গেছে এখানে থেকে ওই পড়ে হত উকিল, সেখানে পড়ে এসে হবে ব্যারিষ্টার; এখানে সিবিল সার্ভিস পাশ করে হবে ডেপুটী, বিলেতে পাস করলে হবে একেবারেই ম্যাজিষ্ট্রেট। আর বিলাত ফেরতের যে মান তা আর বলব কি? দেখবেন প্রমোদ ফিরে এলে একবার কি জয় জয়কারই না পড়ে যাবে দেশে, বড়লাট নিজে এসে হাত বাড়িয়ে দেবে।”

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চোখের জল শুকাইয়া গেল, তিনি কল্পনাচক্ষে দেখিতে পাইলেন প্রমোদের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া বড়লাট, কাণে শুনিলেন চারিদিকে জয়ধ্বনি।

পুলকে প্রাণটা ভরিয়া উঠিল, তথাপি সন্দিগ্ধ চিত্তে বলিলেন "কিন্তু বিলেত গেলে সে যে খৃষ্টান হয়ে যায় মণি।"

মণি মিত্র অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন "আজ্ঞে না। কে দেখছি আপনাকে এই সব বলে আপনার মনে এই সন্দেহটা জাগিয়েছে। বিলেত আজকাল হিন্দুর দেশ হয়েছে বললেও হয়। সেখানে কত হিন্দু স্ত্রী পুত্র নিয়ে বাস করছে, আমাদের কত দেব দেবীর মন্দির হয়েছে সেখানে, এমনি পূজার্চ্চনা সবই হয়। বিলেত বলতে আপনারা কেমন লাফিয়ে উঠে কেঁদে ফেলেন তা দেখলে ভয় হয়। আমরাই নিত্যি বিলাত যেতে পারতুম যদি তত টাকা আমাদের থাকত। টাকার অভাবেই যেতে পাই নে। প্রমোদের কপাল ভাল তাই অমন একটা বন্ধু জুটেছে যে অমনি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল।"

আশ্বস্তচিত্তে পিতা বলিলেন "তবে কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই বল।"

মণি মিত্র বলিলেন, "আরে রামোঃ—বিপদ আবার কি? নিত্য কত লোক যাওয়া আসা করছে।"

হরগোবিন্দ একটু ভাবিয়া বলিলেন "কিন্তু বিলাত হতে এলে পর সমাজ যদি তাকে না নিতে দেয় আমায়?"

মণি মিত্র বলিলেন 'কেন, সে তো খৃষ্টানও হবে না, মেমও বিয়ে করে আনবে না—তবে সমাজের ভয় কি? আচ্ছা, এখন বাড়ী যান তো, বছর তিনেক পরে সে আসবে, তখন তার

ব্যবস্থা আমিই করে দেব, আপনার সে জন্যে কোনও ভাবনা নেই।”

হরগোবিন্দ বিস্ময়ের সুরে বলিলেন “বছর তিনেক পরে?”

মণি মিত্র বলিলেন “তা নয় তো কি? পড়া শেষ হবে তবে তো আসবে, আগেই তো চলে আসতে পারে না।”

কোনও ক্রমে হরগোবিন্দকে ঠেলিয়া তিনি বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

কিন্তু ভাবনাটা তাঁহারও হইয়াছিল বড় কম নয়। ভাল ভাবিয়াই তিনি গরীব পুরোহিতের একমাত্র পুত্রকে কলিকাতায় স্বব্যয়ে পড়াইতে লইয়া গিয়াছিলেন। সে যে যাইয়াই এরূপ সর্ব্বনাশ করিয়া যাইবে তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

তিনি কিছুতেই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলেন না। প্রমোদ খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে, সে যে রেভারেণ্ড মনমোহন দত্তের কন্যা লিলিকে বিবাহ করিয়াছে, তাহার পর রেভারেণ্ড মহাশয় তাহাকে ব্যারিষ্টারী পড়াইবার জন্য বিলাত পাঠাইয়াছেন। শোকের প্রতিমূর্ত্তি এই পিতার নিকটে সে কথা মুখ ফুটিয়া কেহ বলিতে পারে কি?

তিন বৎসর মণি মিত্র সময় লইলেন। ইহার আগে প্রমোদ ফিরিয়া আসিলেও হরগোবিন্দ যে তাহার সন্ধান পাইবে না সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত রহিলেন। গ্রামের যে যে কলিকাতায়

থাকিত তাহাদের তিনি একবার নিষেধ করিয়া দিলে—এ ভরসা তাঁহার আছে কেহ সে কথা পুরোহিত মহাশয়ের কানে তুলিবে না, কারণ পুরোহিত মহাশয়ের এই মনস্তাপে সকলেই আন্তরিক দুঃখিত।

* * *

আশায় আশায় পুত্রের আশাপথ পানে চাহিয়া পিতার তিনটী বৎসর কাটিয়া গেল।

মণি মিত্রকে পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন "না, সে তো আজও আসে নি।"

হরগোবিন্দ আকাশ হইতে পড়িলেন, পুত্রের অমঙ্গলাশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। "আসে নি? সেখানে তার কোনও অসুখ বিসুখ"—

মণি মিত্র হাসিয়া বলিলেন "ক্ষেপেচেন? তা'হলে আগেই টেলিগ্রাম আসত। সে কি একটা হেঁজি পেঁজি আপনার মত লোক?"

কিন্তু সত্য কিছুতেই গোপন রহিল না। একদিন কোথা হইতে কেমন করিয়া প্রকাশ হইয়া গেল প্রমোদ অনেকদিন আগেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছে, এবং হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস করিতেছে। আরও শুনা গেল সে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জনৈক খৃষ্টিয়ান যুবতীকে বিবাহ করিয়াছে।

হা অদৃষ্ট !—

মূর্চ্ছিতপ্রায় হরগোবিন্দ পড়িয়া রহিলেন, দয়া চোখের জল ফেলিতে তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিল।

বৃদ্ধ আবার উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন "সত্যি সে আর আসবে না দয়া? আর তার বাপ, তার বোনের কাছে ফিরবে না?"

দয়া বলিল "না বাবা, সে আর আস্‌বে না?"

"আসবে না? ওরে পাষাণী, অমন কথা বলিস নে, বলিস্ নে। এ কথা বল্‌তে কি তোর বুকটা ফেটে গেল না?"

বৃদ্ধ দুই হাতের মধ্যেই মুখ লুকাইয়া অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

দয়া তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল "কেন ফাটবে বাবা? স্বধর্ম্মত্যাগী ছেলের জন্যে তোমার এই কান্না, এ কি মানায়? সে তোমায় ভুলে গেল, আমায় ভুলে গেল, আমরা তার জন্যে হাহাকার করে কাঁদব? কেন কাঁদব? সে ভুলতে পারলে—আমরা পারব না কেন? ছি বাবা, তুমি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মের পানে-চেয়ে ছেলেকে ত্যাগ করতে পারবে না? কিন্তু এই দেশে অনেক মেয়েও তো তা করেছিলেন। মেয়েতে যা পেরেছে পুরুষ হয়ে তা পারবে না তুমি?"

হরগোবিন্দ চোখের জল মুছিয়া শান্ত হইলেন। ইহারই কিছুদিন পরে তিনি শুনিতে পাইলেন প্রমোদের অসুখ—

পিতার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িল, তাহাকে একবার দেখিবার জন্য তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাঁহার সহিত একবার দেখা হইলেই প্রমোদ ফিরিয়া আসিবে, সে কিছুতেই খৃষ্টান সমাজে বাস করিতে পারিবে না।

দয়াকে কোনও কথা তিনি হঠাৎ সাহস করিয়া বলিতে পারিতেছিলেন না, কারণ এই তেজস্বিনী মেয়েটীকে তিনি বেশ চিনিতেন। তাঁহার অস্থিরতা দেখিয়া দয়া নিজেই জিজ্ঞাসা করিল "দাদার খবর পেয়েছ বাবা ?"

হরগোবিন্দ যেন বাঁচিয়া গেলেন—"তার বড় অসুখ দয়া।"

দয়া তেমনি শান্ত কণ্ঠে বলিল "তুমি একবার সেখানে যেতে চাও—না বাবা ? একবার দেখে আসতে বড্ড ইচ্ছে করছে, না?"

হরগোবিন্দ সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন "হ্যাঁ—না, তবে কি—"

বাধা দিয়া দয়া বলিল "না, যাবে যাও, আমি তোমায় আর বাধা দেব না। কিন্তু সত্যি বলছি বাবা—দেখো, দাদা তোমায় চিনতেই পারবে না মোটে, হয় তো দেখাই করবে না। সে এখন সাহেব হয়ে গ্যাছে, তুমি হচ্ছো সামান্য পল্লীগ্রামের দীন দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ, সে বাড়ীর গেট পার হবার ক্ষমতা তোমার হবে না।"

অস্বাভাবিকরূপ আশ্চর্য্য হইয়া হরগোবিন্দ দয়ার মুখের উপর দুইটী চোখ রাখিয়া বলিলেন "দূর পাগলি, তাও কি হতে পারে কখনও? আমি যে তার বাপ, আমি যদি একবার তার সামনে যেতে পারি, দেখবি তাকে আমার সঙ্গে আসতেই হবে। আমি এমন ঢের ঘটনা জানি যাতে বাপের কাছে ছেলেকে শেষটায় ক্ষমা চাইতেই হয়েছে।"

দয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "যাবে যাও বাবা, আমি তাতে আপত্তি করব না। শেষটায় তোমার মনে যে ক্ষোভ থেকে যাবে আমিই তোমাকে দাদার সঙ্গে মিলতে দেই নি, সেটা হতে দেব না। তুমি এতবড় জ্ঞানী হয়েও যখন বুঝতে পারলে না, অথবা সব বুঝেও যখন শিশুর মতন অবোধ হয়ে রইলে তখন আর কোন কথা বলাই অন্যায়। কিন্তু এর পরে বুঝতে পারবে বাবা যখন ঘা খেয়ে ফিরতে হবে।

তিন

হ্যাঁ বাবা, এ রকম করে বসে থাকলে তো দিন চলবে না। কাজ কর্ম্ম সবই ছেড়ে দিলে, তারপরে কি হবে?"

সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া হরগোবিন্দ বলিলেন "আর কাজ কর্ম্মের দরকার কি মা? কাজ কর্ম্ম সব চুলোয় যাক আমার, কিছু দরকার নেই!"

একটু উগ্রস্বরে দয়া বলিল "চুলোয় যাবে বই কি? তোমার কি, দু'দিন বাদে চোখ বুজবে, আমি যে তোমার গলায় পড়েছি সেটা ভেবে দেখছ? তুমি মরলে আমি কি পেটের জন্যে সেই অধম খৃষ্টানটার বাড়ী যাব? বাধ্য হয়ে হয় তার বাড়ী যেতে হয়, নয় লোকের বাড়ী দাসীবৃত্তি করতে হয়। দয়া বামনী যে এই দুই কাজের একটাও পারবে না সে ঠিক কথা জেনে রেখো! বাপ হয়ে তাহলে তুমি আমায় আত্মহত্যা করতে বল?"

একান্ত নিরুপায় ভাবে পিতা কন্যার পানে চাহিয়া বলিলেন 'তবে আমায় কি করতে বলিস দয়া?"

দয়া বলিল, "উঠে নিজের কাজ কর্ম্ম দেখ। আমার জন্যে কিছু তো করে রেখে যেতে হবে। শ্বশুর বাড়ী নেই যে একবেলা কতে পাব। ঘরে যে দামোদর আছে, এই

তিনদিন অন্য লোক ধরে এনে পূজো করছি। আজ কে পূজো করবে তুমি ছাড়া? ওঠো, স্নান করে এসে পূজো করে নাও।"

বৃদ্ধকে দুঃখ করিতে একটু ভাবিতে অবকাশ দয়া দিবে না। সে ঠিক জানিয়াছিল যত সে আলগা দিবে পিতার স্থবিরতা ততই বাড়িবে।

কন্যার তাড়নায় হরগোবিন্দ স্নান সারিয়া আসিয়া পূজায় বসিলেন।

সিংহাসন হইতে দামোদর তুলিয়া তিনি একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন, দুই চোখ দিয়া দরদর ধারে অশ্রু ধারা ছুটিল।

"বল ঠাকুর, একবার বল, কি পাপে এবং কাহার পাপে এ ঘটিল? সেই তো প্রমোদ, ওগো ঠাকুর, ওগো সর্ব্বান্তর্যামী দেবতা, তুমিও তো দেখিয়াছিলে তাহাকে, তাহার হাতের পূজাও তো পাইয়াছ তুমি, সেই প্রমোদ, সে আজ ধর্ম্মত্যাগী খৃষ্টান? ভগবান, তুমি কি যথার্থই ঘুমাইয়া আছ? একবার জাগো—হে দেবতা, একবার জাগো, পুত্রহারার বক্ষে পুত্র আনিয়া দাও।"

সে দিন—যে দিন হরগোবিন্দ পুত্রকে ফিরাইয়া আনিতে কলিকাতায় গিয়াছিলেন, সে দিন কত না আশা কত না

আনন্দ। তিনি দামোদরকে সেদিন পূর্ণ দুই ঘণ্টা কাল ধরিয়া পূজা করিয়া কত প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কত আশা ছিল প্রমোদকে আনিয়া তাহাকে দামোদরের প্রসাদ দিবেন। হায়, হায়, সকলি ব্যর্থ হইল—সবই গেল?

দরজার কাজে দাঁড়াইয়া ছিল দয়া, সে গোপনে চোখ মুছিয়া ফেলিল; কণ্ঠের আর্দ্রতা মুহূর্ত্তে শুষ্ক করিয়া সে তীব্র কণ্ঠে ডাকিল "বাবা"—

"হ্যাঁ মা, এই যে পূজো করছি—"

তাড়াতাড়ি কণ্ঠ বিলম্বিত নামাবলীতে চোখ দুইটা মুছিয়া ফেলিয়া হরগোবিন্দ পূজা করিতে বসিলেন।

কিন্তু হায়, একটী আঘাতেই যে হৃদয়খানা উলট-পালট হইয়া গিয়াছে। স্মৃতি যে মন্ত্রগুলোকে আর টানিতে পারিতেছে না।

দয়া নিকটে বসিয়া বলিল, "ও কি ছেলেখেলা হচ্ছে তোমার বল তো? দেবতা নিয়ে তোমার কখনো তো ভুল হয় নি। মনে কর মন্ত্র গুলো; আমি দেখব, অনেকদিন তোমার পূজো দেখি নি।" কন্যার নিকটে অসহায় শিশুর মত পিতা তিরস্কৃত হইয়া আবার পূজায় মন দিলেন।

পূজা শেষ হইয়া গেলে দয়া বলিল, "নাও, এবার একটু জল খেয়ে নিয়ে খানিক বেড়িয়ে এসো গিয়ে। তিনদিনে যা চেহারা হয়েছে দেখ না, যেন পোড়া কাঠ একখানা। আচ্ছা

বাবা, তোমার ধর্ম্ম দামোদর বড় না তোমার ছেলে বড় তাই জিজ্ঞাসা করি ?"

অস্ফুট স্বরে হরগোবিন্দ বলিলেন, "তাও কি জিজ্ঞাসা করবি দয়া ?"

দয়া বলিল "তবে বল ধর্ম্ম বড় ?"

হরগোবিন্দ উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ, ধর্ম্মই বড়।"

দয়া বলিল, "ধর্ম্ম যদি বড় হয় বাবা, তবে সেই ধর্ম্ম আঁকড়ে ধরে দামোদরকে ছেলে বলে বুকে তুলে নাও। এই তোমার সংসার। এই তো তুমি বল বাবা দামোদর যা করান তাই হয়, তবে এও তো দামোদরেরই কৃত একটা কাজ। অসার পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে তুমি এ কি করছ বাবা ?—দামোদরের 'পরেও বিশ্বাস হারাচ্ছ ? ভুলে যাও বাবা, মনে কর তোমার কেউ নেই—ছেলে নেই, মেয়ে নেই, সংসার স্বজন কেউ নেই, আছে একমাত্র দামোদর, ছোট্ট ওই শিলা-খানির মাঝে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপী ভগবান। বাবা, দামোদরকে ভাব, দামোদরকে ডাক, যাতে তোমার কাজ হবে। আর ক'দিন বাবা, জীবন তো ফুরিয়ে এসেছে; স্বধর্ম্মত্যাগী পাপিষ্ঠের চিন্তা মনে নিয়ে দেহ ত্যাগ করবে তা হবে না।"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া হরগোবিন্দ বলিলেন, "তুই ঠিক কথাই বলছিস দয়া। এ আকুল আহ্বান যদি ভগবানের জন্যে হত, সে একটা কাজ হত! এ কেবল আমার ভস্মে

ঘি ঢালা হচ্ছে মাত্র। কিন্তু তবু বলছি, স্নেহ নিম্নগামী, উর্দ্ধগামী হতে পারে না। আমি চেষ্টা করছি নে কি? কিন্তু সবই যে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, আমার ক্ষমতায় আর কুলাচ্ছে না। দেখ দয়া, ছেলেরা ভাবে না বাপ কি, কিন্তু নিজেরা যখন বাপ হয়, তখন বুঝতে পারে সন্তান স্নেহ কেমন। আচ্ছা, এটা তো বরাবরই হয়ে আসছে, ছেলে যে সে তো জানে একদিন সে বাপ হবে, তবে জেনে শুনে কেন এমন করে বলতে পারিস?

দয়া রাগ করিয়া বলিল, "তোমার মত আমার তো এত সময় নেই বাবা যে যত সব অকেজো ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামাতে যাব। আমার সংসারের কাজ আছে, অত সব দিক দেখতে গেলে আমার দিন চলে না।"

হরগোবিন্দ কন্যার মুখের উপর সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমাকে তুই কি ভুলাচ্ছিস দয়া? তোর মনের কথা আমার কাছে গোপন করে রাখতে চাস্, কিন্তু তোর চোখ মুখই যে তা বলে দিচ্ছে। ওরে পাগলী মনে ভাবিসনে তোর বাপের বয়স ষাট পার হ'য়ে গেছে বলে চোখের জ্যোতি একেবারে হ্রাস হ'য়ে গেছে। আমি আর কিছু ভাল করে না দেখতে পেলেও তোর মুখ বেশ দেখতে পাই। তোর অতি রাগভরা কথার মধ্যেও যে বেদনার সুর বেজে উঠছে মা, সে কি লুকাবার? কথা বলতে গিয়ে তার মাঝে এক একবার চুপ করে থেমে যাস্, হাসতে গিয়ে বার করে ফেলিস কান্নারই

সেই করুণ সুরটা, মনে করিস্ এ গুলো আমার কাণে বেজে ওঠে না? পাগলী ভুলাতে চাস কাকে? আমি যে তোর বাপ, আমি তোকে যে হাতে ক'রে মানুষ করেছি, আমি তোর ছলনায় ভুলব? জোর করে তাকে উড়িয়ে দিতে চাস—সে *স্বধর্ম্মত্যাগী বলে, কিন্তু তাতে কি শান্তি পাচ্ছিস তুই? তোর প্রাণ কি হাহাকার করে কেঁদে উঠে বলছে না—হোক্ সে* স্বধর্ম্মত্যাগী, তবু সে আমারই ভাই? একই মায়ের বুকের দুধ খেয়েছি, একই বাপের কোলে মাথা দিয়ে দুজনে ঘুমিয়েছি! বল মা—বল একবার সত্যিই কি তাকে তাড়াতে পেরেছিস মন হ'তে?"

"বাবা—"

উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া উঠিয়া দয়া পলাইয়া গেল।

হরগোবিন্দ চোখের জল মুছিতে মুছিতে গভীর আবেগে ডাকিলেন "দামোদর"।

চার

দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া হরগোবিন্দ যে দিন শয্যা গ্রহণ করিলেন। সে ছিল শ্রাবণেরই ঘনঘোর মেঘাচ্ছন্ন একটি দিন।

চারি দিক্ মেঘে ছাইয়া গিয়াছে, সেই অন্ধকারময় ঘন মেঘের কোলে ঝিক্ মিক্ করিয়া সৌদামিনীর খেলা। বাদল বাতাস ঝির্ ঝির্ করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। চারি দিকে সেঁত সেঁতে ভাব স্পষ্ট জাগিয়া উঠিতেছিল, কি রকম একটা বাদলার গন্ধ বাতাসে গৃহমধ্যে ভাসিয়া আসিতেছিল।

দয়া পিতার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল, হরগোবিন্দ চুপ করিয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন। চারি দিক্ নিস্তব্ধ, সন্ সন্ করিয়া বাতাস আসিয়া এক একবার শুধু চালের মট্কা-খানা কাঁপাইয়া যাইতেছিল।

হরগোবিন্দ হঠাৎ চমকাইয়া উঠিতেই দয়া তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি বাবা, চমকে উঠলে কেন ?

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া হরগোবিন্দ চাহিলেন "চমকে উঠেছি? কই, না।"

দয়া চুপ করিয়া রহিল।

হরগোবিন্দ একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন "গেল বছর আজকের দিনেই আমি প্রমোদকে আনতে কলকাতায় গেছলুম, না দয়া?"

দয়া নিঃশ্বাসটাকে দমন করিয়া বলিল "হ্যাঁ বাবা।"

হরগোবিন্দ বলিলেন "কিন্তু সে দিনকার আকাশটাতো বড় পরিষ্কার ছিল, একটু মেঘও ছিল না। যদি আজকের মত আকাশ হ'ত, তবেই ঠিক হ'ত, না দয়া? আজকের আকাশটা ঠিক আমার মনের মত—দেখ্‌ছিস্‌?"

দয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "কেবল সেই কথাই ভাববে বাবা?"

হরগোবিন্দ বলিলেন "আর কি ভাবব দয়া?"

দয়া বলিল "নারায়ণকে ডাক বাবা, তোমার দামোদরকে ভাবো।"

হরগোবিন্দ হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন "দামোদকে ভাবব? দামোদরকে তো আমি হাতে করে মানুষ করিনি দয়া। যেমন ভাবে পূজো করি তার বেশী আর কিছুই করতে পারি নি। কিন্তু তাকে যে বড্ড বেশী দিয়েছিলুম দয়া, সারা বুকটাই ভরে রেখেছিলুম তার কথায়, তার হাসিতে, তার

আকৃতিতে। কেমন করে জানবি দয়া, এই একটা বছর কেমন করে তার কথা মাত্র উত্থাপন না করে আমি বেঁচে ছিলুম? বুকের ভেতর জ্বলে যাচ্ছিল, বাইরে দেখেছিলি হাসি, তাকে ভুলে গেছি এমনি ভাব। নারে না, আমি তাকে একটু ভুলি নি, দিন দিন তার ছোট্ট কথাগুলো পর্য্যন্ত আমার বুকে জেগেছে। নারায়ণ, তোমাকে ডাকতে গিয়ে ডাকতে পারি নি প্রভু, আমায় মার্জ্জনা কোরো।"

দিন দিন তাঁহার অবস্থা খরাপ হইয়া আসিতেছিল। দয়া কবিরাজ দেখাইবার প্রস্তাব করিলে, তিনি মাথা নাড়িলেন।

দয়া বলিল "কেন বাবা, কবিরাজী ওষুধ তো তুমি খাও, তবে দেখাতে নারাজ হচ্ছো কেন?"

হরগোবিন্দ মৃদু হাসিয়া বলিলেন "আর কেন মা, দিন যে এগিয়ে এসেছে। পঁয়ষট্টি বছরের ঝড় তুফান রোদ বৃষ্টি সমান ভাবে মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে, আর কেন? নদীর জলে বান ডেকেছে, বাঁধ দিতে চেষ্টা কেন, এ বাঁধ যে বালির, এখনি খসে যাবে। আমায় আর কেন জড়াতে চাস মা, আমার বাঁধন খুলে দে। বড় জ্বালায় জ্বলেছি, ঘুমিয়ে একটু শান্তি লাভ করি।"

দয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল "আমাকে কার হাতে দিয়ে যাবে বাবা, আমার যে আপনার বলতে আর কেউ নেই।"

পিতার চোখের কোণে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, উদাত্তকণ্ঠে তিনি বলিলেন "দামোদরের হাতে দিয়ে যাচ্ছি মা, দামোদর থাক্‌তে তোর ভাবনা কি ? সেই তোর বাপ, ভাই। সব যায় যাক্‌, কিন্তু দামোদর গেলে তোর সব যাবে।"

দয়া কেবল চোখ মুছিতে লাগিল।

সেই দিন মণি মিত্র আসিয়া বলিলেন "প্রমোদকে খবর দিয়েছি, আমি নিজেই গেছলুম তার কাছে।"

হরগোবিন্দ একটু হাসিয়া বলিলেন "কিছু দরকার নেই মণি—এ সময় আর কাউকেই চাই নে। এখানে থাকলে বড় জ্বালায় জ্বলতে হয়, কারণ অসীম জ্ঞানীও সংসারের মোহে পড়ে আপনাকে হারিয়ে ফেলে। আমি যে লোকে যাচ্ছি, সেখানে তাকেও একদিন যেতে হবে। সেখানে ধর্ম্মভেদ নেই, প্রত্যেক ধর্ম্মই প্রত্যেক ধর্ম্মের সমান। সেইখানে আমি তার দেখা পাব। তাকে বলো, আমি তাকে আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি, সে সুখী হোক, সুখে থাক। আমায় অসুখী করেছ বলে দামোদর যেন তাকে অসুখী না করেন। তার ছেলে যেন তার মতের বিরুদ্ধে কখনও না চলে আমি সে প্রার্থনাও করছি।"

মণি মিত্র বলিলেন, "আপনি অত অধীর হবেন না— আপনাকে প্রবোধ দেবার ধৃষ্টতা আমি রাখি না। তবুও আমি বলতে চাই—সবই বিধিলিপি। আমায় বিশ্বাস করুন, সত্যই

প্রমোদ আজ অনুতপ্ত—সেও আজ ফিরে আস্‌তে চায় তার স্নেহময় পিতার কাছে, কিন্তু সাহস পায় না সে ফিরতে।

হরগোবিন্দ বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন, আসতে চায়—আস্‌তে চায়—আমার স্নেহের দুলাল প্রমোদ আস্‌তে চায়? তবে সে আসে না কেন? দয়া—দয়া—মণি বলছে, প্রমোদ নাকি আস্‌তে চায়। হাঁ হাঁ, তুমি তাকে আস্‌তে বলে দাও—কিসের ভয়? ছেলে আসবে বাপের কাছে।

এতক্ষণ দয়া নীরবে সব শুনিতেছিল। এবার নিষ্করুণ কণ্ঠে সে বলিল, কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন বাবা, যে পুত্র স্বেচ্ছায় সকলের প্রাণে ব্যথা দিয়ে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে চলে গেছে, তাকে কোন দিন ক্ষমা করা যায় না—ক্ষমার অযোগ্য সে। তোমার দামোদর যার হাতে তুলি আমায় দিয়ে যেতে চাইছ, সেও কি এ অনাচার সইবে বাবা?

হরগোবিন্দ মনে মনে বিড় বিড় করিয়া কি বলিতে লাগিলেন। সত্যই কি তাঁহার দামোদর তাই চান? একমাত্র পুত্র অনুতপ্ত হইয়া আজ পিতার কোলে ফিরিয়া আসিতে চায়, অথচ……

মণি মিত্র বলিলেন, যৌবনের যে মোহ প্রমোদকে সব ভুলিয়ে দিয়েছিল, এমন কি স্নেহময় পিতা ও স্নেহময়ী বোনটীর কথা, আজ সেই মোহের ঘোর তার কেটে গেছে, দয়া। আজ অনুতাপের আগুনে পুড়ে খাঁটি সোনায় সে পরিণত হয়েছে, অভয় না পেলে সে আসে কি করে বল?

হরগোবিন্দ কেমন ঝুঁকিয়া উঠিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন—না না, যে আস্তে চায়, তাকে আস্তে দাও মণি।

বাবা—বলিয়া দয়া স্থির নিষ্করুণ নেত্রে চাহিয়া রহিল।

হরগোবিন্দ সে দৃষ্টির সংঘাতে যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন, পরে দম লইয়া বলিলেন, কিন্তু মা, সে যে আমারই ছেলে—সেই মা হারা প্রমোদ। দামোদরের কথা ভাবছিস? কিন্তু মা, সে কি এক ঠুনকো যে প্রমোদের ছোঁয়াচ সে সইতে পারবে না? সে কি শুধু তোর ও আমার দেবতা, আর কারো নয়? তা যদি হয়, তাহলে তাকে আমি দেবতা বলে স্বীকার করবো না দয়া। দেবতা সবারই—জাত-ধর্ম্ম কোন কিছুরই সে তোয়াক্কা রাখে না—সর্ব্বভূতে সর্ব্বজীবে হবে যে তার সমান দৃষ্টি! দয়া—দয়া—

দয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, কিন্তু তুমিই তো শিখিয়েছ বাবা, ধর্ম্মত্যাগী যে তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

আমি শিখিয়েছি—আমি শিখিয়েছি। দামোদর অন্তর্যামী তুমি—না দয়া, প্রমোদ আমাদের কেউ নয়—সময়ে সময়ে কেমন দুর্ব্বলতা আসে—সব ভুল হয়ে যায় মা। ম্লেচ্ছাচার আমার দামোদর সইতে পারবে না মা। কি জানি জোর করে কিছু করতে গেলে যদি তার অমঙ্গল হয়। তার চেয়ে সে সুখেই আছে—সুখেই তাকে থাকতে দাও মণি।

মণি মিত্র গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কিন্তু সুখে সে আদৌ নেই ? সম্প্রতি স্ত্রীটি মারা গেছে শিশু পুত্রের ভার তাকে দিয়ে।

কি বললে—কি বললে মণি ? বৌমা নেই ? কিন্তু আমি তো তা চাই নি। কি করেছ দামোদর ? দয়া—দয়া—আমার দাদু ভাইকে কে তাহলে দেখছে মণি ? কত বড়টি হয়েছে—কেমনটি হয়েছে ? কিন্তু না—বলিয়া হরগোবিন্দ শয্যায় ঢলিয়া পড়িলেন।

পাঁচ

দয়া ঠাকুরঘরে একা পড়িয়া মাথা কুটিতেছিল, পিতার জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানাইতে গিয়া সে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল "বলে দাও প্রভু কি করি ?"

সদানন্দময় পিতা আমার, শিশুর মত সরল, অথচ মহাজ্ঞানী। অথচ আজ তিনি সম্পূর্ণ নিরুপায়—শিশুর মত অসহায়। একদিকে তাঁর স্নেহের দুলাল, স্বধর্ম্মত্যাগী ম্লেচ্ছ পুত্র, অন্যদিকে তুমি। বলে দাও প্রভু কি করলে তুমি সুখী হও ?

দয়া আবেগের সহিত কাঁদিতে লাগিল।

বাহিরে খট খট জুতার শব্দ শুনা গেল, শব্দটা ঠাকুর ঘরের দরজার কাছে আসিয়াই থামিয়া গেল।

দয়া সে দিকে মোটে মনোযোগ দেয় নাই। উচ্ছ্বসিত রোদনে সে কেবল দামোদরকে ডাকিতেছিল।

বাহির হইতে ভীতিবিকম্পিতস্বরে কে ডাকলে, দয়া—দয়া—

দয়া চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিল। এ যে তাহার দাদার কণ্ঠস্বর। তড়িৎগতিতে সমস্ত দেহের মধ্য দিয়া এক অপূর্ব্ব শিহরণ খেলিয়া গেল।

দয়া—দয়া। আবার সেই কণ্ঠস্বর—যেমনি স্নিগ্ধ—তেমনি মধুর।

বাহিরে আসিয়াই সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। আধো রৌদ্র আধো ছায়ার মাঝে ও কে দাঁড়াইয়া? দেয়ালে ঠেস দিয়া কোনমতে সে আপনাকে স্থির রাখিয়াছে, দৃষ্টি দূর আকাশের পানে, যেন মানুষের পানে চাহিয়া কথা বলিতে গেলেই সে ধরা পড়িয়া যাইবে।

দয়া থর থর করিয়া কাঁপিয়া বসিয়া পড়িল। হাঁ, দাদাই তো! সেই মুখ—সেই চোখ—সেই চাহনি। রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল "না না, তুমি এখানে কেন? তুমি চলে যাও।"

কম্পিতকণ্ঠে প্রমোদ বলিল, কিন্তু একটা কথা দয়া!

দয়া তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "না না, ধর্ম্মত্যাগী যে তার সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। তোমারই জন্যে বাবা আজ মৃত্যুশয্যায়—কি মুখ নিয়ে তুমি এসেছ? তুমি যাও—চলে যাও, উঃ, আমার দম বন্ধ হয়ে আস্‌ছে যে।"

হতভাগ্য ধর্ম্মত্যাগীর দুই চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল; রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "সত্যি বলেছিস্ দয়া, আমি ধর্ম্মত্যাগী, আমার সঙ্গে কারও সম্পর্ক নেই। আমি ইহকাল পরকাল সব হারিয়েছি। আমার দেবতা—যাঁকে আমি ধ্রুবতারা বলেই জানতুম, তিনিও আজ আমাকে দেখলে হয়ত ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন। দয়া—আমি চলে যাব, এখনি চলে যাব।

আমি মোহের বশে ধর্ম্মত্যাগ করেছি, তারপর যখন জ্ঞান হয়েছে দেখেছি আর আমার ফিরবার পথ নেই। আমার কলঙ্কিত পাদস্পর্শে এ বাড়ীর মাটী কলঙ্কিত হয়ে উঠছে, বাতাস বিষে ভরে উঠছে। আমি যাব, এখনি যাব, কিন্তু যাবার আগে—একটা কথা বল দয়া—একবার বল আমায় ক্ষমা করেছিস, তাই শুনে চলে যাই। বল দয়া—অন্ততঃ তুই আমায় ক্ষমা করলি কি না?" আর হাঁ, একবার—একবার বাবার সঙ্গে—

প্রমোদ আর বলিতে পারিল না, রুমালে মুখ চাপিয়া ক্ষুদ্র বালকের মত ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

দয়া ভ্রাতার পানে চাহিয়া দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল "না—"

প্রমোদ ব্যগ্র কণ্ঠে "না? পাষাণী দয়া, কে বলে তোর নাম দয়াময়ী, তুই যে পাষাণী, পাষাণ দিয়ে তোর বুক গড়া। রাক্ষসী আমার সুখ শান্তি হরে নিদানে তোর দাদাকে তুই এইটুকু ভিক্ষা দে। মনে কর আমি স্বধর্ম্মত্যাগী, আমি ম্লেচ্ছ হলেও আমি তোর সেই ভাই। মনে কর, বাবার দুই কোলে দু'জন থাকতুম, তুই যা পেতিস আমায় দিতিস, আমি যা পেতুম তোকে দিতুম। মনে কর আমাকে না দেখলে তুই কাঁদতিস, তোকে না দেখলে আমি কাঁদতুম দয়া—ভুলে যাস্ নে, ভুলে যাস্‌নে। সেদিনকার কথাটা মনে করে ক্ষমা কর আমায়, আমি চলে যাই।"

দয়া স্থিরদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল। শীকারকে সাংঘাতিক আহত করিয়া ক্ষুধিতা ব্যাঘ্রী যেমন তাহার সম্মুখের থাবা পাতিয়া বসিয়া তাহার মৃত্যু যন্ত্রণা দেখে, এ দৃষ্টি সেইরূপ। সে স্থিরকণ্ঠে বলিল "আমার ক্ষমার জন্য তুমি লালায়িত? কথাটা নিতান্তই হাসির। যাই হোক, আমি স্বধর্ম্মত্যাগীকে কখনও ক্ষমা করতে পারব না, এ বড় অসম্ভব কথা। আমি মনে করেছি আমার ভাই ছিল বটে, কিন্তু সে আর নেই, তুমি তার ছায়ারূপে এসে আমায় প্রতারিত করছ।"

আর্ত্তকণ্ঠে প্রমোদ ডাকিল, "দয়া, রাক্ষসী—"

তেমনি স্থির কণ্ঠে দয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমি রাক্ষসীই বটে। কিন্তু তুমিই যথার্থ মানুষ। দেবতা বাবা, তাকে তিলে তিলে মৃত্যুমুখে টেনে এনেছে কে—সে তুমিই না? তবুও এখনও পর্য্যন্ত প্রমোদ—প্রমোদ—"

দয়ার কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রমোদ বলিল, "বল দয়া—বল, বাবার কথা বল। আমাকে নিয়ে চল দয়া একবার বাবার কাছে।

দয়া ঘৃণার সুরে বলিল, "আর না, যথেষ্ট হয়েছে। যাও তুমি আর এ পবিত্র ভিটায় দাঁড়িও না। তোমার তবু সব আছে, আমি দুঃখিনী বিধবা, এখানে পড়ে আছি দামোদর নিয়ে আর বাবার স্মৃতি নিয়ে। ওগো, তোমায় মিনতি করি,

তুমি কলঙ্কিত কোর না এই পবিত্র দেবতার মন্দির। যাও, যাও, এখনি যাও, আর দেরী কর না।"

প্রমোদ চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, থাকতে আমি আসিনি দয়া। আমি চলেই যাব। তবে একটা প্রার্থনা তুমি যদি মা-হারা আমার শিশুপুত্রের ভার নাও, তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি। ফুলের মত নিষ্পাপ সে, জাহ্নবীর মত পবিত্র। বল—বল তুমি তার ভার নেবে?

দয়া উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিল, একথা মুখ দিয়ে বলতে তোমার সাহস হল দাদা?

ঠাকুর ঘরের দরজার উপর প্রমোদ একবার মাথা নোয়াইল, ঝর্ ঝর্ করিয়া আবার অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। পরে বলিল, স্ব ইচ্ছায় অধিকার হারিয়েছি দেহগত ধর্ম্ম নষ্ট করেছি, কিন্তু দয়া মনের ধর্ম্ম তো নষ্ট হয় নি, বিশ্বাস তো হারায় নি; ধর্ম্ম ভ্রষ্টের অপরাধ সবাই নিলে দামোদর যে নেবে না তা আমি নিশ্চিত বলতে পারি। তুমি নারী, মায়ের জাত তুমি যে এত নিষ্ঠুর হতে পার তা জানতাম না।

ইতিমধ্যে মণি মিত্র আসিয়া উপস্থিত হইল, বুকে ধরিয়া আড়াই বৎসরের শিশু ও তাহাকে ঠাকুর ঘরের দরজার কাছে নামাইয়া দিল। সে এদিক ওদিক দু'চারবার চাহিল ও তারপর মা মা করিয়া ডাকিতে ডাকিতে দয়াকে জড়াইয়া ধরিল।

কোথা দিয়া কি হইয়া গেল দয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। চ শিশুটি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া মা মা ডাকে তাহার য়ে মাতৃত্বের পরশ জাগাইয়া তুলিল। একবার মাতৃত্বের শ যে নারী পায়, সে কি আর স্থির থাকিতে পারে। অবিস্মৃতের মত দয়া তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া খানি চুমায় চুমায় ছাইয়া দিল।

লাঠিতে ভর দিয়া হরগোবিন্দ আসিতেছিলেন ঠাকুর ঘরে। ং দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে য়া পড়িলেন। কে ঐ শিশু? ও যে সেই শিশু প্রমোদ—সেই মুখ—সেই চোখ—সেই সব। ব্যাকুল কণ্ঠে তিনি ডাকিলেন, দয়া—দয়া।

উচ্ছ্বসিত স্বরে দয়া বলিল,—এ যে দাদার ছেলে বাবা—তোমার নাতি—আমাদের বাড়ীতে আজ নতুন অতিথি।

নতুন অতিথি—নতুন অতিথি। দয়া—দয়া, দে দে আমার বুকে তুলে দে—আমার প্রমোদের ছেলে—আমার দাদুভাই। আয়—আয়—আমার বুকে আয় ভাই।

দাদু—দাদু বলিতে বলিতে শিশু হরগোবিন্দের বুকে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল।

প্রমোদ ডাকিল—বাবা।

কে উত্তর দিবে! হরগোবিন্দ তখন পার্থিব সকল ডাকের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

রামহরি মণ্ডলের একটী মাত্র মেয়ে চন্দ্রা যখন বিধবা মুখে মত পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল তখন গ্রামের সকলেই একটু হঠাৎ উহু করিল। বৃদ্ধ রামহরিকে অনেকে প্রবোধ দিল,—"তা মাত্র কি করবে মোড়লের-পো, ভগবান যা লিখেছেন ওর ভাগ্যে তা ঘটবেই, ও তো আর অন্যথা করা যাবে না।"

রামহরিকেও অগত্যা তাহাই বুঝিতে হইল। না বুঝিলেই বা চলে কই, ভগবানের কাজের অন্যথা তো হইবে না। যে দণ্ড যাহার উপর অর্পিত হইতেছে তাহা হইবেই, রদ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

চোখের জল মুছিয়া রামহরি কন্যাকে পদতল হইতে টানিয়া তুলিল, নিজের জীর্ণ বসনাঞ্চলে তাহার মুখখানা মুছাইয়া দিতে দিতে সান্ত্বনার সুরে বলিল, "কাঁদিস নে মা, যা হয়ে গেছে তা আর তো বদলাবে না। আমার আর সংসারে কেউ নেই, বুড়ো বাপের ভার নিয়ে এখানে থাক।"

চন্দ্রা নিজের শোক সামলাইয়া লইয়া বৃদ্ধ পিতার সেবায় আত্মনিয়োগ করিল।

রামহরি মণ্ডলের বিঘা কতক জমি জমা ছিল, তাহাতে যে ধান উৎপন্ন হইত তাই দিয়া একরকমে সংসার চলিয়া যাইত। এই মেয়েটীকে সাত মাসের রাখিয়া তাহার মা মারা গিয়াছিল, পাড়ার অনেকে তখন রামহরিকে আবার বিবাহ করিবার উপদেশ দিয়াছিল, না হইলে তাহার সংসার চলিবে কি করিয়া? একা সে ক্ষেত খামারের কাজ করিবে, না সংসারের কাজ কর্ম্ম করিবে, সাতমাসের মেয়ে মানুষ করিবে?

তাহারা প্রতিবাসী হিসাবে সৎ উপদেশই দিয়াছিল কিন্তু মূর্খ রামহরি তাহাদের কোন উপদেশই কানে লইল না। দূর সম্পর্কীয়া এক বৃদ্ধা দিদিকে আনিয়া সংসারে রাখিল। সে বৃদ্ধা সব দিন রাঁধিয়া দিতে পারিত না, কেবল মেয়েটীকেই রাখিত। ইহাও রামহরির কাছে ভাল ছিল, সে রাত্রে ফিরিয়া রাঁধিত, তাহাই দিনে রাত্রে দুজনের হইয়া যাইত। ইহার পর কেহ যখন বিবাহ সম্বন্ধে কথা কহিতে আসিত তখন সে হাসিমুখে উত্তর দিত, আর দরকার কি ভাই? মেয়েটাকে মানুষ করার জন্যে ভাবনা ছিল, তা ভগবান একটা দিক দেখিয়ে দেছেন। এখন বিয়ে করে কেবল গলগ্রহ বই তো নয়। চন্দ্রা আমার বেঁচে থাক, ওর বিয়ে দিয়ে জামাই নাতি-নাতনী নিয়ে সুখে দিন কাটিয়ে দেব।”

চন্দ্রা যখন সাত আট বৎসরের তখন বৃদ্ধা দিদি, ইহলোক ত্যাগ করিল। চন্দ্রাকে লইয়া তখন রামহরিকে বেশী কষ্ট

পাইতে হয় নাই, কেন না গরীবের মেয়ে চন্দ্রা তখন বয়সাপেক্ষা বেশী কর্ম্মঠ হইয়া উঠিয়াছে। সে তখন হইতে জোর করিয়া ভাত রাঁধা, জল তোলা, বাসন মাজা প্রভৃতির ভার লইয়াছিল। খেলার সময় তাহার খুব অল্পই ছিল, খেলার সঙ্গীও তাহার দুই একটী ছাড়া বেশী ছিল না। বাড়ীর কাছেই হরিচাঁড়ালের বাড়ী, মাছ ধরিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া হরি জীবিকা নির্ব্বাহ করিত! সংসারে তাহার একটীমাত্র পুত্র প্রেমলাল, সাধারণে তাহাকে পেমা বলিয়া ডাকিত, আর পেমার বিমাতা। বিমাতা ছেলেটীর উপর মোটেই সদ্ব্যবহার করিত না, সামান্য একটু ত্রুটি ঘটিলেই সে তাহার আহার বন্ধ করিয়া দিত, এই অবস্থায় রামহরির শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া পেমার আর উপায় ছিল না। মাসের মধ্যে কুড়িদিন সে রামহরির বাড়ী খাইত, দশটা দিন বাড়ীতে খাইত। চন্দ্রার একান্ত খেলার সঙ্গী ছিল এই চাঁড়ালের ছেলেটী, এতটুকু বেলা হইতে সে পেমাকে দেখিয়া আসিতেছে।

বিমাতা যে সপত্নীর পুত্র কন্যার উপর কতখানি শত্রু হয় এবং কি ভাবে ব্যবহার করে তাহা রামহরি পেমা, তাহার মা ও বাপের ব্যবহার দেখিয়া জানিতে পারিয়াছিল। এত বড় গ্রামখানার মধ্যে এক ঘর এই অন্ত্যজ চাঁড়াল বাস করিত। গ্রামের লোকে ইহাদের যতদূর সম্ভব এড়াইয়া গিয়া নিজেদের শুচিতা রক্ষা করিত, ইহাদের কোন খোঁজই কেহ রাখিত না।

অদৃষ্টক্রমে ছেলেটী রামহরির কাছে আসিয়া পড়ায় রামহরি ইহাদের যাবতীয় কথা জানিতে পারিয়াছিল, পুনর্ব্বার বিবাহের নামে সে জ্বলিয়া উঠিত। সে আপনার চোখে দেখিত—গ্রামের লোকের কথায় ভুলিয়া সে আবার বিবাহ করিয়াছে, নববধূ তাহার কন্যাকে বিধিমতে লাঞ্ছনা করিতেছে।

যখন চন্দ্রার বিবাহ হইয়াছিল তখন সে দ্বাদশ বর্ষিয়া বালিকা মাত্র। অনেক দেখিয়া শুনিয়া রামহরি অন্য গ্রামস্থ ভরত মণ্ডলের পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া ফেলিল। ভরতের অবস্থা খুব ভাল ছিল, ছেলেটিও বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছিল, তাহাদের কৈবর্ত্ত সমাজে এমন ছেলে আর একটী ছিল না বলিলেও চলে। মেয়েটী নাকি সুন্দরী ছিল তাই ভরত আরও বড়ঘরে ছেলের বিবাহ দিবার কথা ভুলিয়া এইখানেই সম্বন্ধ ঠিক করিয়া বসিল।

বিবাহের সময় রামহরি এ পর্য্যন্ত যাহা সঞ্চয় করিয়াছিল সবই কন্যা জামাতাকে দান করিয়া ফেলিল। সে যে উল্টা নিয়ম চালাইল ইহার জন্য আত্মীয় স্বজন সকলেই তাহার কার্য্যের নিন্দা করিল।

বিবাহের পরে চন্দ্রাকে পিত্রালয় ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, চোখের জল ফেলিয়া রামহরি বেহাইয়ের হাত দুখানা ধরিয়া আর একটা বৎসর কন্যাকে নিজের কাছে রাখিবার প্রার্থনা করিয়াছিল কিন্তু ভরত কোন মতেই রাজি হয় নাই। সে

বেহাইকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল বিবাহের পরে কন্যাকে পিত্রালয়ে রাখা একেবারে অন্যায়, দৃষ্টান্ত স্বরূপ সে আপনার সাত, দশ ও বার বৎসরের তিনটী মেয়ের উদাহরণ দিয়াছিল যে এই মেয়ে তিনটী বিবাহের পরে আর পিত্রালয়ে আসিতে পায় নাই।

সে আজ তিন বৎসরের কথা। এই তিন বৎসরের মধ্যে চন্দ্রা আর পিতার কাছে আসিতে পায় নাই। পিতার চোখের জল ঝরিয়া পড়িতে পড়িতে শুকাইয়া উঠিত—না, তাহাদের অকল্যাণ হইবে যে। কন্যা স্বামী-আলয়ে রহিয়াছে, যে কোন নারীর ইহা সৌভাগ্যের কথা যে।

তিন বৎসর পরে চন্দ্রা বিধবা অবস্থায় পিতার কাছে জীবন কালের জন্য চলিয়া আসিল। সে নাকি অকল্যানী অপয়া, শ্বশুর শাশুড়ী তাই পুত্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছেন।

পিতা কন্যাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল, একবার করিয়া কাঁদিয়া বলিল, বাপ মার কাছে কল্যাণ অকল্যাণ নেই মা, তুই যাই হ' না কেন, আমার এ দরজা তোর কাছে চিরমুক্ত।

দুই

তিন বৎসর পূর্ব্বে যে চন্দ্রা ছিল এ যেন সে চন্দ্রা নয়, তাহারই ছায়া মাত্র। সে চঞ্চলতা তাহার ছিল না, দৌড়াদৌড়ি, হাসি, বেশীকথা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রা নিঃশব্দে সংসারের কাজ করে, কেহ বুঝিতে পারে না সে আছে কি না।

শুধু রামহরির বক্ষেই এ আঘাতটা প্রবলরূপে বাজে নাই, আর একজনের বক্ষে বড় কঠোররূপে বাজিয়াছিল, সে পেমা চাঁড়াল, হরে চাঁড়ালের পুত্র।

এখন সে অষ্টাদশ বর্ষীয় কিশোর, সংসারের অনেক সে লাভ করিলেও এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই। স্বামী মরিলে মানুষ যে একেবারে এমন করিয়া বদলাইয়া যায় তাহা সে জানে না, তাই যতই সে চন্দ্রার কথা ভাবিতে লাগিল, যতই চন্দ্রাকে দেখিতে লাগিল ততই আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে লাগিল।

চন্দ্রা এখন তাহাকে এমন ভাবে এড়াইয়া যায় কেন তাহা সে ভাবিয়া পায় না। সেদিন অভুক্ত সে—পথের ধারে চুপচাপ বসিয়াছিল, সাহস করিয়া আগেকার মত রামহরির বাড়ীতে

যাইয়া জোর করিয়া ভাত চাহিয়া খাইতে পারে নাই। রামহরি মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় তাহাকে দেখিতে পাইয়া নিজের বাড়ীতে যখন ডাকিয়া লইয়া গেল তখন আনন্দে তাহার হৃদয়খানা ভরিয়া উঠিয়াছিল—এইবার চন্দ্রাকে সে সম্মুখে দেখিতে পাইবে। আজ মাস তিনেক হইল চন্দ্রা এখানে আসিয়াছে ইহার মধ্যে একদিন মাত্র সে ঘাটের পথে তাহাকে দেখিয়াছিল। আগেকার মতই—কি চন্দ্রা, ভাল আছ তো—বলিয়া চন্দ্রার সম্মুখীন হইতেই চন্দ্রার মুখখানা হঠাৎ পাংশু হইয়া উঠিয়াছিল, সে একটাও উত্তর দেয় নাই, মুখের উপর ঘোমটাটা আরও খানিক নামাইয়া দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গিয়াছিল। চন্দ্রার মুখখানা সে ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই, সেই ক্ষোভটা মনের মধ্যে জাগিয়া ছিল। এ দিন তাই সে ভাবিয়াছিল ভাত দিতে চন্দ্রাকে নিশ্চয়ই বাহিরে আসিতে হইবে, সে সেই সময় চন্দ্রাকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইতে পারিবে।

কিন্তু চন্দ্রা বাহির হইল না। দাওয়ায় ভাত দিয়া আগেই সে সরিয়া গিয়াছিল, পেমার ব্যাগ্র ব্যাকুল চোখ দুইটী চারিদিকে ঘুরিল—কিন্তু কোথায় সে?

মুহূর্ত্তে তাহার ভাত তরকারী যেন তিক্ত বিস্বাদ হইয়া গেল, অন্তরটা বড় ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। বটে, সে আজ এতই পর হইয়াছে, সম্মুখে বাহির হইলেও দোষ হয়? তিন বৎসর

আগে তো তাহাকে ছাড়া চন্দ্রার খেলা হইত না, চন্দ্রার ছোট বড় সকল কাজেই পেমাকে দরকার পড়িত।

ঝাঁ করিয়া একটা নূতন কথা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। সে চাঁড়াল বলিয়া গ্রামের অন্য সকলের মতই কি চন্দ্রা তাহাকে ঘৃণা করে? এই যে সেদিন দাসেদের বাড়ীর মেয়েটি—নাকি ছোঁয়া জল তাহার গায়ে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল তাই তাহাকে কত না গাল দিল। চন্দ্রাও বোধহয় এখন তাহাকে ঘৃণা করিতেছে, জাতের কথা বড় হইয়া তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে।

মুখখানা তাহার বিকৃত হইয়া উঠিল, বড় বড় চোখ দুটি মুহূর্ত্তের জন্য জ্বলিয়া উঠিয়া নিমেষে ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। সে আর খাইতে পারিল না, কণ্ঠনালি কে যেন চাপিয়া ধরিল, সে পাত কুড়াইয়া কুকুরটাকে ডাকিয়া সবগুলো খাইতে দিল।

চন্দ্রা দরজার পাশে দাঁড়াইয়া দেখিল, সে একটাও ভাত খাইল না সব ফেলে কুকুরটাকে ধরিয়া দিল, দেখিল হঠাৎ পেমার বড় বড় চোখ দুইটী তীব্র ভাবে জ্বলিয়া উঠিয়া তাহার পরেই ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। বিধবা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস কোন মতে রোধ করিয়া রাখিতে পারিল না, সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল।

হায় রে কে জানিতে পারিবে আজ পেমার সম্মুখে সে

কেন যাইতে পারিতেছে না? অস্পৃশ্য চাঁড়াল বলিয়া সে কোন দিন পেমাকে ভাবিতে পারে নাই, চিরদিন তাহাকে নিজের ভায়ের মত দেখিয়াছে। সেদিন ঘাট হইতে ফিরিবার পথে পেমা যখন তাহাকে ডাকিয়া কথা বলিয়াছিল তখন সে সঙ্কোচ লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া কথা কহিবে ভাবিয়াছিল, সেই সময়েই তাহার সঙ্গিনী মেয়ে দুইটীর পানে চোখ পড়িতেই সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। মেয়ে দুইটী এমনভাবে হাসিয়াছিল যাহাতে লজ্জা পাইবারই কথা। সেই মুহূর্ত্তে তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছিল সে বিধবা, এখন যে কোন পুরুষের সহিত কথাবার্ত্তা বলা দোষাবহ।

ইহার পরে দুই একজনের দুই একটা ফিসফাস্ কথাও তাহার কানে আসিয়া তাহাকে আরও সঙ্কুচিত করিয়া তুলিয়াছে। যদিও সে জানে পেমা-দা তাহাকে নিজের বোনের মতই ভালবাসে, তাহার সরল মনে পাপ থাকিতে পারে না তথাপিও সে সাহস করিয়া আর পেমার সম্মুখে বাহির হইতে পারিল না; কে জানে যদি আবার কেহ কোন কথা বলে।

সে বুঝিতে পারিতেছিল, কাজটা বড় খারাপ হইতেছে, পেমা-দা'র সরল মনে সে বড় আঘাত দিয়াছে, পেমা-দা বড় ব্যাথা পাইয়াছে। কিন্তু এ ব্যথা জুড়াইবে সে কি করিয়া? লোক-নিন্দাকে সে কি করিয়া ঠেকাইবে?

বিবাহের পূর্ব্বে—যখন যে বালিকা ছিল তখন সে পেমার

সহিত মিশিত, খেলা করিত তখনই অনেক লোকে ঠাট্টা করিয়াছিল, অনেকে বলিয়াছিল—রামহরি মেয়ের জন্যে পাত্র খুঁজছে কেন, পাত্র তো কাছেই রয়েছে।

এই দিন হইতে পেমা সাবধান হইয়া গেল, সে বেশ বুঝিল চন্দ্রা আর সে চন্দ্রা নাই, সেও এখন তাহার চিরকালের সাথী পেমা-দাকে ঘৃণা করে, কারণ পেমা চাঁড়াল, অস্পৃশ্য।

এতদিন গ্রামসুদ্ধ সকলের ঘৃণা কুড়াইয়াও যে কষ্ট সে অনুভব করে নাই, তাহাকে ঘৃণা করে জানিয়া সেই কষ্ট সে পাইল। আজ মনে হইল সে অস্পৃশ্য। আর্ত্তকণ্ঠে একবার সে শুধু আকাশের পানে তাকাইল, তাহার বুকের নীরব ভাষা মূর্ত্ত হইয়াই ভগবানের চরণে লুটাইয়া পড়িল।

সত্যই—এ ব্যবধান কেন? চণ্ডাল যাহার হস্তে সৃজিত, ব্রাহ্মণও সেই হস্তে সৃজিত, যেখান হইতে উভয়ে আসিয়াছে সেইখানেই উভয়ে যাইবে, একই বিচারপতি উভয়ের বিচার করিবেন, তিনি তো জাতি ধর্ম্ম বিচার করিয়া দণ্ড দিবেন না, কার্য্যের ফলাফল দেখিয়া বিচার করিবেন। দুদিনের অধিবাসী—সংসারে আসিয়া কেন এই ভেদাভেদ নিজেদের মধ্যে গড়িয়া লইয়াছে? ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া চণ্ডালের অধম কার্য্য করিয়া কেহ সম্মানীত হইতেছে, চণ্ডালের বংশে জন্ম লইয়া ব্রাহ্মণাপেক্ষা মহৎ কাজ করিয়াও কেন যে-চণ্ডাল সেই চণ্ডাল থাকিয়া যাইতেছে। মানুষ দেখিয়া যায় শুধু জাতি,

বাহ্যিক ধর্ম্মের ভাণ, প্রকৃত যাহা কেহ তাহা চিনিতে পারে না।

পেমা শুধু ভাবিতে লাগিল কেন এ রকম হয়? তাহার যদি কোনও উচ্চ বংশে জন্ম হইত সে এই বৈষম্য দূর করিতে পারিত, তাহার কথা লোকে কান দিয়া শুনিতও, কিন্তু হায় রে, সে যে নীচ চাঁড়ালের ছেলে, সে কথা বলিতে গেলে লোকে যে আগেই দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে কারণ সে অস্পৃশ্য।

তিন

পেমা সেদিন নিজেদের দাওয়ায় বসিয়া চুপচাপ এই কথাই ভাবিতেছিল। বিমাতা পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিল, ঝুপ ঝাপ করিয়া বর্ষার বারিধারা আকাশ চিরিয়া ধরার বুকে ঝরিয়া পড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র উঠানে একটু জল দাঁড়াইয়া গেল।

সেই জলের পানে চাহিতে চাহিতে কবেকার পুরাণ স্মৃতি পেমার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। আগে এমনি জল খানার ডোবায় জমিয়া থাকিত, চন্দ্রার অনুরোধে সে কতদিন খেলা-ঘরের নৌকা এমনি জলে ভাসাইয়া দিয়াছে! আজও তেমনি জল

জমিয়াছে, আজ তাহার ইচ্ছা করিতেছে তেমনি করিয়া নৌকা ভাসাইয়া দেয়, কিন্তু চন্দ্রাকে তো সে আজ পাইবে না।

বৃষ্টি যখন ছাড়িয়া গেল তখন সমস্ত অঞ্চলটা মাথায় জড়াইয়া বিমাতা বাড়ী ফিরিল। আসিয়াই অকারণে পেমাকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল—আ পোড়ারমুখো ডেক্‌রা, তোর মনে মনে এতও ছিল হতচ্ছাড়া ছোঁড়া। আজ আসুক আগে বাড়ী ফিরে, তোকে আচ্ছা করে জব্দ করে তবে ছাড়ব। তোর জন্যে আমায় এত কথা শুনতে হয় কেনরে হতভাগা? সতীনের বেটা, জ্বালাতেই রয়েছিস, দূর হয়ে যা না কেন—তুইও বাঁচিস আমিও বাঁচি।”

অকারণে বিমাতাকে এরূপে সপ্তমে চড়িয়া উঠিতে দেখিয়া পেমা প্রথমটায় অবাক হইয়া গেল। সে জানিত বিমাতার রাগের সময় কোনও কথা বলিলে সে আরও চটিয়া চেঁচাইয়া গালাগালি দিয়া পাড়া জমকাইয়া তুলে; তাই যখন শ্যামা বকিয়া বকিয়া চুপ করিল তখন শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “কি হয়েছে মা, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি নে কি করেছি।”

“কি করেছিস,” শ্যামা মুখ সিঁটকাইয়া বলিল, “কি করেছিস তা জিজ্ঞাসা করছিস কোন মুখে রে পোড়ারমুখো? লোকে কত কথা বলছে তার কিছু জানিস? তুই মণ্ডলদের বাড়ী

হামেসা যাওয়া আসা করিস কেন? গাঁয়ের লোকে আজ তাদের ঠেলা করে রাখলে, আর তাদের বাড়ী কেউ যাবে না, কেউ তাদের কিছু খাবে না। আ মর হতচ্ছাড়া, তোর মনের মধ্যে এতও ছিল, তোর জন্যেই তো ভালমানুষ রামহরি মণ্ডল আজ জাতে ঠেলা রইল। আজ মাছ ধরে কর্ত্তা আগে বাড়ী আসুক না, জুতিয়ে তোর হাড় গুড়ো করে দেবে এখন।”

পেমা শুধু ফেল ফেল করিয়া তাকাইয়া রহিল। সে মাত্র দুই দিন রামহরি মণ্ডলের বাড়ীতে গিয়াছিল, আর তো যায় নাই। তাহার এই দুই দিন যাওয়ার অপরাধে বৃদ্ধ রামহরি মণ্ডল আজ জাতে ঠেলা হইয়া রহিল। কিন্তু কেন, সে তো তাহাদের ঘরে যায় নাই, একদিন দাওয়ায় খাইতে বসিয়াছিল, আগেও তো প্রায়ই খাইত তখন কত লোকই তো তাহাকে খাইতে দেখিয়াছে তবে তখন কেন রামহরি মণ্ডলের জাতি গেল না, এখনই বা গেল কেন?

এ ‘কেন’র উত্তর সে খুঁজিয়া পাইল না।

মণ্ডলের বাড়ীতে একবার গিয়া সব খবরটা জানিয়া লইবার জন্য তাহার মন ছুটিতে লাগিল, কিন্তু সে যায় কি করিয়া? লজ্জায় সঙ্কোচে সে যেন মুসড়িয়া পড়িতেছিল, আবার সে যাইবে কোন্ মুখে, তাহার জন্যেই যে তাহারা জাতিচ্যুত হইয়াছে? সে যে অস্পৃশ্য চাঁড়াল, তাহাকে দাওয়ার উপর

ভাত দেওয়ার অপরাধে নিরপরাধ বৃদ্ধ আজ জাতিচ্যুত। সকল কাণ্ডের মূল হইয়া সে কেমন করিয়া আবার সেখানে গিয়া দাঁড়াইবে?

সে স্থির করিল, সন্ধ্যার পরে সে চুপি চুপি রামহরি মণ্ডলের বাড়ী যাইবে; ব্যাপারখানা কি তাহা শুনিয়া আসিবে।

সে দিন তাহার পিতার বাড়ী ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল, বাড়ী ফিরিবামাত্র শ্যামা তাহাকে শুনাইয়া দিল, তাহার ছেলে হইতেই বৃদ্ধ রামহরি মণ্ডলের জাতিটা নষ্ট হইয়া গেল।

হরে চাঁড়াল পুত্রকে তাড়াইয়া যাইতেই সে তিন লম্ফে উধাও হইয়া গেল।

আকাশ জুড়িয়া তখন কালো মেঘ সাজিয়া আসিয়াছে, বাতাসটা থামিবামাত্র বৃষ্টি নামিল।

ঝর্ ঝর্, ঝর্ ঝর্ অবিশ্রান্তধারে জল ঝরিতে লাগিল, চোখ ধাঁধিয়া বিদ্যুৎ ছুটিতেছিল, কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছিল। নিরাশ্রয় কিশোর পথের ধারে একটা গাছতলায় দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিল। আজ সে যাইবে কোথায়? অন্য দিন পিতা তাড়াইয়া দিলে সে সটান রামহরি মণ্ডলের দাওয়ায় গিয়া উঠিত, আজ সে এক পাও নড়িতে পারিল না। বিদ্যুতের আলোয় নিকটবর্ত্তী রামহরি মণ্ডলের ঘর দাওয়া ঝল্সিয়া উঠিতেছিল, সে বদ্ধনেত্রে সেই দিকে চাহিয়া ছিল।

কড় কড় কড় কড়!

আকাশের গা চিরিয়া আগুনের শিখা ছুটিয়া ধরার দিকে নামিল, ডাকিতে ডাকিতে সোজা অগ্রসর হইল।

"বাবা গো—"

আর্ত্তভাবে চেঁচাইয়া উঠিয়া দুই কানে দুই হাত চাপা দিয়া পেমা ছুটিয়া রামহরির দাওয়ায় উঠিতে আছাড় খাইয়া পড়িল। বজ্র তখন দাওয়ার নিকটবর্ত্তী একটী নারিকেল গাছের উপর গিয়া পড়িয়াছে, গাছটা সেই বৃষ্টির মধ্যেও জ্বলিতেছে।

তাহার আর্ত্তস্বর শুনিয়াই রামহরি দরজা খুলিয়া আলো হাতে দাওয়ায় আসিয়া তাহাকে অর্দ্ধমূর্চ্ছিতপ্রায় পড়িয়া থাকিতে দেখিল। তাড়াতাড়ি চন্দ্রা পিতার আদেশে জল লইয়া আসিল, পিতা ও কন্যা পেমায় শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

পেমার ভয়টা কাটিয়া গেলে সে উঠিয়া বসিল। রামহরি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, "বাজ পড়া দেখে বুঝি ভয় পেয়েছিস পেমা? এই দুর্য্যোগে ঘরের বার হয়েছিস কেন, ছিলি কোথায়?"

পেমা বলিল, "বাবা তাড়িয়ে দিয়েছে। ওই গাছতলাটায় দাঁড়িয়ে ছিলুম, তারপর—"

চন্দ্রা ভৎসনার সুরে বলিল, "আর বাজ এসে যদি ওই গাছটার ওপরই পড়ত তা হলে কি হত?"

পেমা শান্তভাবে বলিল, "তা হ'লে তো ভালই হতো

চন্দ্রাদিদি, একেবারেই মরে যেতুম, একটু একটু করে তো মরতে হ'ত না।”

আজ সে এই প্রথম চন্দ্রাকে দিদি বলিয়া ডাকিল, চন্দ্রা এ ডাকে সত্যই হৃদয়ে পুলক অনুভব করিল, হৃদয়খানা তাহার করুণায় ভরিয়া উঠিল।

রামহরি বলিল, “তোর বাবা আজ তোকে তাড়ালে কেন পেমা ?”

পেমা কথাটা গোপনে রাখিতে পারিল না, বলিল “আমার জন্যে নাকি তোমরা জাতে ঠেলা হ'য়ে রইলে, তাই মা বাবাকে বলবামাত্র বাবা একটা বাঁশ নিয়ে মারতে এল, কাজেই আমি পালালুম। বাবা বলেছে আমায় আর বাড়ীতে ঢুকতে দেবে না, দেখি—তা যদি হয় কাল সকালে ভিন গাঁয়ে চলে যাব, দুটো ভাত যেমন করেই হোক গেলে জুটবেই। আমি কি করেছি কাকা, তোমার দাওয়ায় বসে শুধু ভাত খেয়েছি এক দিন, এতেই এখন লোকে তোমায় জাতে ঠেলে রাখলে ? আগে তো কতদিন তোমার দাওয়ায় ভাত খেয়েছি তা বুঝি লোকের চোখে পড়ে নি।”

হায় রে, দাওয়ায় ভাত খাওয়ানোর অপরাধে রামহরি জাতিচ্যুত হয় নাই এ কথা কেমন করিয়া এই সরল কিশোরটিকে সে বলে ? জ্ঞাতি ভাই কিশোরের সহিত জমি জমা লইয়া যে বিবাদ বাধিয়াছিল সেই বিবাদের কালে কিশোর স্বজাতির

মধ্যে একটা আন্দোলন তুলিয়াছিল—রামহরির কন্যা চন্দ্রা ভ্রষ্টা, চণ্ডাল পুত্র পেমা রামহরির জাতি নষ্ট করিয়াছে, সেই জন্য আজ বৃদ্ধ রামহরি সমাজ-চ্যুত, আজ তাহার সংসারে কন্যাটী ছাড়া আর কেহ নাই।

চন্দ্রা মুখ ফিরাইয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল। রামহরি খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তাই বটে, সেই জন্যেই আমার জাত গেছে, তোর বাপ তোকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কাল তোর বাপ যদি তোকে জায়গা না দেয়, তুই ভিন গাঁয়ে ভাতের জন্যে যাবি কেন রে পেমা, আমার বাড়ীতে থাকতে পারবি নে? জাতে আমায় ঠেলা তো করেছেই, আর তো কিছু করতে পারবে না। বুড়ো হয়েছি, কবে আছি কবে নেই তার ঠিক কি; তার পরে আমার অবর্ত্তমানে তোর এই বোনের ভার নিয়ে তুই থাকতে পারবি নে?"

পেমা বিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া বৃদ্ধের পানে চাহিয়া রহিল, অস্ফুটকণ্ঠে বলিতে গেল—"আমি যে চাঁড়াল,—"

"তাতে কি এসে গেল রে পেমা? চাঁড়াল আলাদা জায়গা হ'তে আসে নি, আলাদা জায়গায় যাবেও না, আমিও যেখান হ'তে এসেছি তুইও সেখান হ'তে এসেছিস, নিজেকে চাঁড়াল বলে এত হীন ভাবছিস কেন? আমার বড় ভাবনা—আমি মরে গেলে চন্দ্রার ভার কে নেবে, কে তাকে দেখবে। তোকে

যদি পাই পেমা—আমি যে বড় নিশ্চিন্ত হ'য়ে চোখ বুজতে পারি। আমি জানি, চন্দ্রা যদি পবিত্র থাকে তবে সে তোরই কাছে থাকবে, জগতে আর কেউ তোর মত তাকে রক্ষা করে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। ভয় কি, তোকেও তোর বাপ মা তাড়িয়ে দিয়েছে, আমাকেও সমাজ তাড়িয়ে দিয়েছে, এখন তোকে উপলক্ষ্য ক'রে আমরা বেঁচে থাকি, আমাদের উপলক্ষ্য ক'রে তুই বেঁচে থাক। তোর নিজের বোন চন্দ্রা, তাই মনে করে ওর ভার নে। মনে কর্ তুই চাঁড়াল নোস, তুইও কৈবর্ত্ত হয়ে গেছিস।"

হাঁপাইয়া উঠিয়া চন্দ্রা ডাকিল—"বাবা"—

তাহার মাথায় হাতখানা বুলাইতে বুলাইতে রামহরি বলিল, "ভাবছিস কেন, চন্দ্রা আর ভয় কি, কারণ আমি যে সমাজ-ছাড়া, আর তো কেউ আমায় চোখ রাঙাতে পারবে না, আর তো কেউ শাসন করতে পারবে না। ভগবান তোর আশ্রয় জুটিয়ে দিচ্ছেন, শিশুর মত মন যার তাকে অবিশ্বাস করিস নে, এ আশ্রয় হারাস নে।"

চার

গ্রামে তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল, রামহরি চণ্ডালকে নিজের গৃহে সাদরে স্থান দিয়াছে, সমাজচ্যুতের স্পর্দ্ধায় সকলেই চটিয়া উঠিল।

প্রধান মণ্ডল রাসবিহারী রামহরিকে ডাকিয়া পাঠাইল, রামহরি প্রথমটায় নড়িল না; তাহার পর কি ভাবিয়া উঠিয়া গেল।

তাহাকে সম্মুখে দেখিয়াই প্রধান মণ্ডলের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, রাগ সামলাইয়া সে ভারি গলায় বলিল, "শুনলুম তুমি নাকি চাঁড়ালটাকে তোমার বাড়ীতে রেখেছ, তুমি জানো এ তোমার ভারি অন্যায় কাজ হয়েছে?"

শান্তকণ্ঠে রামহরি বলিল, "যে সমাজ-চ্যুত হয়েছে সে জানে তার কাছে চাঁড়াল বামুন ভেদাভেদ নেই। তোমরা কেউই তো আমায় হুঁকোয় তামাক দেবে না মণ্ডল, তবে অতটা মাথা ঘামানোর দরকার কি? তোমরা সেদিন স্পষ্টই তো বলেছ আমার যদি কোন বিপদ আপদ হয় তোমরা দেখবে না, মরলে কেউ কাঁধ দেবে না। এ সব কথা শুনে বাধ্য হ'য়ে আমায় চাঁড়ালকে ঘরে আনতে হয়েছে। মরলে পর মেয়েটা না হয়

মুখে আগুনই দিতে পারবে, পারে তো নিয়ে যেতে পারবে না।”

প্রধান মণ্ডল ভয়ানক চটিয়া গেল, রাগের মুখে খুব শাসাইল, রামহরি তাহাতে কান দিল না, চলিয়া আসিল।

দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। পেমার পিতা পেমাকে আর নিজের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিল না। গ্রামের লোকে তাহাকে শাসাইয়া ছিল যদি সে পেমাকে গ্রহণ করে তাহা হইলে এখানকার বাজারে তাহাকে মাছ বিক্রয় করিতে দিবে না। অবাধ্য ছেলেটার জন্য পেমার পিতা নিজের জীবিকার পথ বন্ধ করিতে পারিল না।

শিশুর মত সরল হৃদয় পেমা মহা আনন্দে রামহরির বাড়ী রহিয়া গেল। চন্দ্রাকে সে ভালবাসে—যথার্থ অন্তর ঢালিয়া ভালবাসে, কিন্তু সে ভালবাসার বৈশিষ্ট্য আছে। সে চন্দ্রাকে পাওয়ার কল্পনা কোন দিনই করে নাই, শিশু যেমন চাঁদ দেখিতে ভালবাসে, চাঁদ দেখিয়া চাঁদের আলো দেখিয়া যেমন তাহার তৃপ্তি তেমনি চন্দ্রাকে দেখিয়া চন্দ্রার কথা শুনিয়া পেমা বড় তৃপ্তি পায়।

চন্দ্রার মুখের হাসি একেবারেই মিলাইয়া গিয়াছিল, পেমার এই গম্ভীর মুখ দেখিতে মোটেই ভাল লাগিত না। সে মনে ভাবিত—স্বামী কি এবং স্বামী মরিয়া গেলে হাসিই বা যায় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর সে কোন দিনই পায় নাই। চন্দ্রাকে

জিজ্ঞাসা করায় সে শুধু মলিন হাসিয়াছিল মাত্র, কোন উত্তর দেয় নাই।

জাতির স্বতন্ত্রতা পেমা প্রাণপণে বাঁচাইয়া চলিত। ইহাদের ঘরের চৌকাঠ সে কখনও পার হয় নাই। বাহিরের কাজ সে মহা আনন্দে সব করিয়া ফেলিত, ঘরের কাজ চন্দ্রা নিজে সব করিত। একদিন চন্দ্রার জ্বর হইয়াছিল, সেই জ্বর লইয়াও তাহাকে জল তোলা ঘরের কাজ সবই করিতে হইয়াছিল। ব্যাকুল ভাবে পেমা তাহার কাজ দেখিতেছিল, সে চাঁড়াল বলিয়া ঘরের কাজে তাহার অধিকার ছিল না। মুখ ফুটিয়া সে দিন সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আচ্ছা চন্দ্রাদিদি, কি করলে কৈবর্ত্ত হ'তে পারা যায় ?"

চন্দ্রা তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিয়াছিল, তখনই গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিল, "দূর বোকা, যে যে জাত তা ছাড়া অন্য জাত বুঝি হ'তে পারে ? আমি কৈবর্ত্ত, বামুন হ'তে পারি বুঝি ? কৈবর্ত্তের ঘরে না জন্মালে কৈবর্ত্ত হ'তে পারা যায় না। তুমি যদি কৈবর্ত্ত হ'তে চাও পেমা-দা, তা হলে তোমায় মরে কৈবর্ত্তের ঘরে জন্মাতে হবে ?"

যদি সত্য সত্যই মরিয়া কৈবর্ত্তের ঘরে আবার ঠিক এত বড়টী হইয়া জন্মগ্রহণ করা যাইত তাহা হইলেও বা পেমা মরিয়া দেখিত। রামহরির মুখে সে যে সব পুরাণ কথা শুনিত তাহাতে জানিয়াছিল, মরিলেও কত কাল ধরিয়া কোথায় থাকিতে হয়

তাহার পর আবার জন্ম লইতে হয়। বাবা, যদি একশত বর্ষ তাহাকে মরার পরে শুধু ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, তাহার পর জন্মিয়া তাহার লাভ কি? তখন তো সে আসিয়া চন্দ্রাকে আর দেখিতে পাইবে না। বাপু, কাজ নাই মরিয়া কৈবর্ত্তের ঘরে জন্ম লইয়া, সে হইতে চাঁড়াল হইয়া তফাতেই থাক, চন্দ্রাকে তো দেখিতে পাইবে।

সে দিন রামহরি অসুস্থ অবস্থায় মাঠ হইতে বাড়ী ফিরিল, সে জ্বর ছাড়িল না, প্রত্যহ তাহার উপরে জ্বর আসিতে লাগিল, ইহার সহিত সর্দ্দি কাশী, বুকে ব্যথা, চন্দ্রা ব্যাকুল হইয়া পেমাকে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইল।

ডাক্তার আসিল না। গ্রামের সর্দ্দার ডাক্তারবাবু বাড়ী গিয়া তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া উৎসাহ দিয়া হাত করিয়া লইয়াছিল। জীঘাংসায় হৃদয় তাহার পুড়িয়া যাইতেছিল, অবাধ্য রামহরিকে কোন ক্রমে জব্দ করা চাই-ই।

চন্দ্রা মাথায় হাত দিয়া বসিল। দরিদ্র কৃষকের ঘরে নগদ অর্থ থাকে না, বেশী টাকা দিতে পারিলে এখনই পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে ডাক্তার আনানো যায়। বাঁচানোর দিকে তখন তাহার দৃষ্টি, তাই সে কাকা কিশোরের বাড়ী ছুটিল—এক বিঘা জমী বন্ধক রাখিয়া সে যদি দশটা টাকাও দেয়।

কিশোর মাথা নাড়িয়া বলিল, "এক বিঘা জমি আর কতটুকু, ও রেখে কেউ দশটা টাকা দেয়? ওর সঙ্গে আর যে

কয়বিঘা জমি আছে সবসুদ্ধ যদি বন্ধক রাখো, তা হ'লে কুড়িটা টাকা এখনি দিতে পারি।"

চন্দ্রা তাহাতেই রাজি হইল, এখন তাহার টাকার বড় দরকার, কুড়িটা টাকা—ইহাতে পিতার চিকিৎসা বেশ হইবে।

একখানা কাগজে হাতের টিপ দিয়া সে টাকা লইল।

বড় ডাক্তারও আসিল, ঔষধও আসিল, কিন্তু পিতা রক্ষা পাইল না। চন্দ্রাকে পেমার রক্ষণাবেক্ষণে রাখিয়া রামহরি ইহলোক ত্যাগ করিল।

কুড়ি টাকার মধ্যে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা দিয়া চন্দ্রা এ দিনকার কাজ এক রকম মিটাইয়া লইল, জমি কয়বিঘা বন্ধক ছিল, পেমার ইহাতে শান্তি ছিল না। সে চন্দ্রার সহিত পরামর্শ করিয়া থালা ঘড়া কয়েকটী বিক্রয় করিয়া কুড়ি টাকা সংগ্রহ করিয়া চন্দ্রাকে আনিয়া দিল।

টাকা দিতে যাইবা মাত্র কাকা রাগিয়া আগুন। কয়েকটী সর্দ্দার গোছের লোককে ডাকাইয়া সেই কাগজখানি দেখাইয়া সে বলিল, "আপনারা দেখুন—দাদা মারা যাওয়ার দু দিন আগে চন্দ্রা আমায় কুড়ি টাকা দিয়ে এই আট বিঘে জমী বিক্রি করেছে। এখন চাঁড়ালটার কথা শুনে সেই কুড়ি টাকা ফিরিয়ে এনে দিচ্ছে—বলছে জমী দিতে হবে।"

চন্দ্রার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, নির্ব্বাকে সে খানিক কাকার পানে তাকাইয়া কম্পিত পদে বাড়ী ফিরিল।

সে যত সহজে সহ্য করিয়া গেল পেমা তত সহজে সহ্য করিল না। সে চেঁচাইয়া গ্রাম মাথায় করিল এবং যেরূপেই পারুক কিশোরকে শাস্তি দিবে প্রতিজ্ঞা করিল। চন্দ্রা কিছুতেই তাহাকে শান্ত করিতে পারিল না।

দুই দিন পরে হঠাৎ একদিন কেমন করিয়া চন্দ্রার ধান বোঝাই গোলাটায় যে আগুন ধরিয়া গেল তাহা বুঝা গেল না। অনেক চীৎকারে গ্রামের লোক কেহ এই পতিতার সাহায্যার্থ আসিল না, লুকাইয়া সকলেই মজা দেখিতে লাগিল।

আগুন নিভাতে একটী পুরুষ ও একটী নারী প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল, গোলায় আগুন উড়িয়া যে ঘরের চালে লাগিয়াছিল সে দিকে তখন কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই।

ধূ ধূ ধূ, আগুন জ্বলিতে লাগিল, সে আগুন নিভান গেল না। দূরে দাঁড়াইয়া জলহীন স্তব্ধনেত্রে চন্দ্রা দেখিল বিনাদোষে তাহার যথাসর্ব্বস্ব কেমন করিয়া আগুনে পুড়িয়া যায়! আর্ত্তকণ্ঠ ভেদ করিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল, প্রাণপণে সে কণ্ঠ বন্ধ করিয়া রাখিল।

সমস্ত রাত্রি জ্বলিয়া জ্বলিয়া ভোরের দিকে আগুন নিভিয়া আসিল। ভোরের আলো যখন ধরার গায় আসিয়া পড়িল তখন বাড়ী ও গোলা ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

"পেমা-দা, এখন আমার আশ্রয় কোথায়, আমি কোথায় যাব গো?"

এই বলিয়াই সে হাহাকার করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

পেমা শূন্য নয়নে দগ্ধ ঘরখানার পানে চাহিয়াছিল। চন্দ্রার কথায় মুখ ফিরাইল, তাহার হাতখানা ধরিয়া টানিয়া তুলিতে তুলিতে শান্তস্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কাঁদছিস্ কেন চন্দ্রা, আমি তোর বড়দাদা, আমি এখনও বেঁচে রয়েছি যে তুই বলছিস তোর সব গেছে, সব তো যায় নি বোন। চল দিদি, আমরা দুই ভাই বোনে কলে যাব, তুই ঘরে থাকবি আমি কলে কাজ করে টাকা আনব। তোর বাবা শুধু তোরই বাবা ছিল না রে, সে আমারও বাবা ছিল। আমায় চিনেছিল বলে তোকে আমার হাতে দিয়ে গেছে। চন্দ্রা দিদি, আজ ভাল করে আমার পানে চেয়ে দেখ আমি তোর দাদা। মনে কর আজ আমি চাঁড়াল নই।"

চন্দ্রা তাহার হাতখানা নিজের মাথার উপর রাখিয়া কাঁদিয়া বলিল, "না তুমি আজ চাঁড়াল নও, তুমি আজ আমার সত্যি-কারের ভাই, তুমি আজ কৈবর্ত্ত হয়ে গেছ। আজ তুমি আমার দাদা—দাদা—"

"দিদি—"

পেমার চোখ দিয়া জ্ঞানে এই প্রথম দু ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

অপরাধিনী

বহুদিন পরে হঠাৎ দেখা।

একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার গৃহিণী,—স্বামী রাজোপাধি প্রাপ্ত, সকলে মীরাকে রাণীমা বলিয়াই ডাকে। অপরা কণিকা বা কণা গৃহস্থ বধূ,—তাহার স্বামী কোন অফিসে সামান্য চল্লিশ টাকা বেতনে কাজ করে।

মীরার সঙ্গে আত্মীয়া দাসদাসী অনবরতই ঘুরে, আর কণার সংসারে একটী দাসী পর্য্যন্ত নাই, সমস্ত কাজই তাহাকে নিজের হাতে করিতে হয়।

তবু তাহারা একদিন পরমবন্ধু ছিল। স্কুল জীবনে—কলেজ জীবনে তাহারা একটী দিনের জন্য ছাড়াছাড়ি হয় নাই। আই, এ, পড়িবার সময় অনুপমসুন্দরী মীরা রাজপুত্র বধূ হয়, কণা পড়িতে থাকে, সেই তাহাদের ছাড়াছাড়ি।

ঐশ্বর্য্য ও জাঁকজমকের মধ্যে পড়িয়া মীরা অচিরেই পূর্ব্ব-জীবনের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। দরিদ্রা কণা পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞামত তাহাকে পত্র দিয়াছিল, তাহা পড়িবার অবকাশ পর্য্যন্ত তাহার হয় নাই। দুখানি পত্র দিয়া উত্তর না পাইয়া কণা আর পত্র দেয় নাই।

প্রায় তিন বৎসর পরে একদিন বুঝি তাহার কথা মীরার মনে পড়িয়াছিল, তখন সে একবার খোঁজ লইয়াছিল। তখন কণা কোথায় চলিয়া গিয়াছে সে খবর কেহ দিতে পারে নাই। তাহার পর আবার তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সুদীর্ঘ ছয় বৎসর পরে, কাশীর পথে মীরার সহিত কণার দেখা হইয়া গেল।

মীরা কণাকে হঠাৎ চিনিতে পারে নাই। লালপাড় শাড়া পরিধানে—সিথায় সিন্দুর কণাকে দেখিয়া হঠাৎ চেনাও মুস্কিল। সে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতেছিল, ভিজা খোলা-চুল তাহার কাঁধের উপর দিয়া কতকগুলো সামনে আসিয়া পড়িয়াছিল।

মীরা প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল, সঙ্গে ছিল তাহার দাসী ও একজন শরীর রক্ষক। এই মেয়েটীর সামনা সামনি একেবারে আসিয়া পড়ায় মেয়েটী মুখ তুলিয়া চাহিল, মৃদু হাসির রেখা তাহার মুখে নিমেষের তরে জাগিয়া উঠিল, সে পাশ কাটাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

তাহার মুখের পানে তাকাইয়া আত্মবিস্মৃত মীরা বলিয়া উঠিল—"কণা—"

কণা একটু হাসিল, বলিল, "হ্যাঁ আমি কণা, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মীরা বলিল, "আমি তোমার খোঁজ করেছিলুম, শুনেছিলুম তুমি কোথায় গেছ কেউ তা জানে না। ভাগ্যে এখানে এলুম তাই তো তোমার সঙ্গে দেখা হল!"

ইহার পর দুই সখীতে খানিক কথাবার্ত্তা হইল, উভয়েই উভয়ের আমুল পরিবর্ত্তন জানিতে পারিল, দুজনেই দুজনের জন্য অন্তরে ব্যথা পাইল, কিন্তু সে ব্যথার কথা একটা তাহাদের মুখে ফুটিল না।

কণা ভাবিতেছিল মীরায় কতখানি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেই মীরা—যে বিলাসিতা ঘৃণা করিত, বৈদেশিক চাল চলন ঘৃণা করিত সে আজ বিলাসিনী, বৈদেশিক ভাব তাহার মজ্জাগত। মীরার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল, একটা নিঃশ্বাসও সে ফেলিয়াছিল।

মীরা ভাবিতেছিল—সেই কণা, সে বি, এ ডিগ্রি লাভ করিয়াছে, অথচ সামান্য চল্লিশ টাকা বেতনের একজন কেরাণীকে স্বেচ্ছায় বিবাহ্ করিয়া কি রকম ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। স্বামীর অনভিমতে সে কোনও কাজ পর্য্যন্ত করিতে যায় নাই, শিক্ষিতার অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া অশিক্ষিতা নারীর মতই গৃহের খুঁটিনাটি কাজ লইয়া দিন কাটাইয়া দিতেছে। ছিঃ, মীরা কখনই এমনভাবে কষ্টকে বরণ করিয়া লইত না, একজনের উপর নিজের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া, আপনার সত্ত্বা ভুলিয়া দিন কাটাইত না।

দুই

কণা কতকগুলি বাসন মাজিতে বসিয়াছিল, সেগুলি ফেলিয়া হাত ধুইয়া আসিয়া সহাস্যে বন্ধুর অভ্যর্থনা করিল। ঘরের মেঝেয় একখানা মাদুর বিছাইয়া দিয়া বলিল, "গরীব মানুষ ভাই, ছোট্ট ঘর, আসবাবপত্রও কিছু নেই,—কোন ক্রমে দিনটা চলে মাত্র। মাদুর পেতে বসতে দিচ্ছি, মনে যেন কিছু করো না।"

জুতা খুলিয়া সঙ্কুচিত ভাবে বসিয়া মীরা বলিল, "না, মনে কিছু করব না, করতুম যদি তা হলে আসতুম না।"

কণা বলিল, "আমি আমার স্বামীকে বলেছিলুম তোমার বাড়ী বেড়াতে যাব, কিন্তু তিনি বললেন, দুদিন যাক, রবিবারে তিনি নিজেই আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, সেই জন্যে যেতে পারিনি ভাই। জানি হয়তো তুমি রাগ করবে—"

মীরা বলিল, "সত্যিই রাগ করেছি কণা, কেননা তুমি অতখানি লেখাপড়া শিখে স্বাবলম্বিনী হয়েও যে স্বামীর কাছে এতটা নত হয়ে থাকো, তাঁর প্রত্যেক হুকুম মেনে চল এটা যেন একেবারেই অস্বাভাবিক ঠেকে। আমি যদি নিজের চোখে

না দেখতুম মোটে বিশ্বাসই করতে পারতুম না তুমি এ রকম ভাবে দিন যাপন করছ।"

কণা একটু হাসিল, বলিল "তুমি কি কর মীরা ?"

মীরা সদর্পে বলিল, "আমি কি করি তা নতুন করে কি বলব ভাই ? আমার স্বামী তিনি স্বামীর মত থাকবেন, আমার কাজে—আমার কথায় কথা বলবার বা হাত দেওয়ার কোন ক্ষমতা তাঁর নেই।"

একটু হাসিয়া কণা বলিল, "দুর্ভাগ্যের কথা—প্রেমদা আমায় সে শিক্ষা দেননি সেইজন্যে'—

ব্যগ্রভাবে মীরা বলিল, "কে ?"

কণা বলিল, "তিনি সম্পর্কে আমার দাদা হতেন, আমারই পরিচিত একটী ছেলে। তিনিই আমার গুরু ছিলেন। তিনি বলতেন স্ত্রীলোক বিয়ে যদি নাই করে সে ভাল কথা, কিন্তু বিয়ে যদি করে তাকে স্বামীর সব কথা মেনে চলতেই হবে।"

মীরা অবজ্ঞাপূর্ণ হাসিয়া বলিলেন, "তিনি যদি অন্যায়ও বলেন—মিথ্যা বলেন, তাও সত্যি বলে মেনে নিতে হবে ? বুঝেছ কণা—এতখানি লেখাপড়া শিখে এতখানি জ্ঞান পেয়েও তুমি যদি মানুষকে দেবতা বলে ভক্তি করতে সুরু কর তবে সে দেবতার মাথায় চড়ে বসতে অপরাধ কি ? একেই তো আমাদের এই দেশ—যে দেশে মেয়েরা পুরুষের কাছ হতে

এতটুকু কিছু পায় না অথচ অত্যাচার নিপীড়ন পর্য্যাপ্ত পায়, এতে যদি মেয়েরা শিক্ষিতা হ'য়েও তোমার মত সেই চিরাচরিত নিয়মে চলে তবে ওদের চোখ ফুটাবে কারা ?"

কণা বলিল, "চোখ ওদের ফুটেই আছে মীরা। কেবল নিজেদের দিকটাই আমরা দেখছি ভাই, ওদের দিকটা দেখছি কতটুকু বল দেখি ? মনে ভাব আমি যদি আমার নিজের দিকটাই শুধু দেখে যেতুম—আমার সংসারে কি তাতে শান্তি থাকত ? সে দিন মিঃ রায়ের বাড়ী গেছলুম। মিঃ রায় অফিস হতে সাড়ে চারটের সময় যখন ফিরে এলেন, তার অনেক আগে তাঁর স্ত্রী টেনিস খেলতে চলে গেছেন। অনেকের কথা শুনেছি, বেচারীরা স্ত্রীর সেবা যত্ন কোনদিন পেয়েছেন বলে শুনি নি। একি অন্যায় নয়, তবু এই সব মেয়েরাই বলবেন—পুরুষেরা আমাদের 'পরে অত্যাচার করেন। অবশ্য করেন না যে তা নয়, কিন্তু সকলেই কি করেন ?

মীরা মুখখানা অন্ধকার করিয়া রহিল।

বাড়ী ফিরিবার সময় কণাকে নিমন্ত্রণ করিয়া সে ফিরিল।

কুমার অরুণেন্দ্র নাথ অতিরিক্ত পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ছিলেন, মীরাকেও তিনি ঠিক সেইমত ধাঁজে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

বল নাচে, যে কোন খেলাতে মীরার সমকক্ষ মেয়ে সমাজে ছিল না বলিলেই হয়, অনেক ইংরাজ মহিলাও তাহাকে ঈর্ষা করিতেন।

পত্নী গর্ব্বে কুমারের হৃদয় পূর্ণ ছিল। সব কর্ম্মে মীরাকে তিনি অবাধ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, কোনদিন তাহাকে সংযত করিবার চেষ্টামাত্র করেন নাই, তাতে মীরা অসংযত ভাবে ছুটিয়াছিল। সংযম তাহার কাছে হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়।

নিতান্ত সাধাসিধা ভাবে কণা রবিবারে একাই রাজ প্রাসাদে আগমন করিল। তাহার স্বামী হেমেন্দ্রনাথ তাহাকে একাই আসিবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

মীরা বাড়ী ছিল না, শুনা গেল—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠিতে গিয়াছে, সেখানে আজ টেনিস খেলা হইবে।

কুমার বাহাদুরের শরীর অসুস্থ ছিল, তিনি যান নাই। আজ কয়েকদিন তিনি শয্যাগত ভাবে পড়িয়া আছেন।

মীরার দাসী কণাকে আদর করিয়া বসাইল; বলিল, এসেছেন একটু বসে যান নইলে রাণীমা এসে শুনে আমাদের আস্ত রাখ্‌বেন না।

কণা বলিল, কুমার বাহাদুরের এই অসুখ দেখে সে ওঁকে রেখে দিয়ে খেলতে চলে গেল?

দাসী একটু হাসিয়া বলিল, রাণীমা তো রোজই খেলতে

যান মা। এই তো সেদিন কি নাচ হয়েছিল, রাণীমা সন্ধ্যেবেলা গিয়েছিলেন, রাত একটার সময় বাড়ী এসেছেন। উনি কোন্ সময়েই বা বাড়ী থাকেন! রাজ রাজড়ার কাণ্ড মা, আজ কোথাও মিটিং, কোথাও মেয়েদের প্রাইজ দেওয়া হবে, সব জায়গায় উনি না হলে দেশের লোকের যেন চলে না।

কণা হতভাগ্য কুমার বাহাদুরের কথা ভাবিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

বাড়ী ফিরিয়াই সে স্বামীকে বলিল, "ওগো, এ বাড়ীটা বদল করে আর একটা বাসা কর, এ বাসায় আর থাকব না।

স্বামী আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিলেন, কেন?

কণা কেবল মাথা নাড়িয়া বলিল, না, এ বাসায় থাকতে আর আমার ইচ্ছে নেই, তুমি বাসা কর।

তিন

দুদিন যাইতে না যাইতে রাজ প্রাসাদে কণার ডাক আসিল।

সন্ধ্যার পরে হেমেন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণ ছিল, তিনি বলিলেন, আমি তোমার ওখানে পৌঁছে দিয়ে নিমন্ত্রণে যাব এখন—কি বল?

কণা গম্ভীর মুখে বলিল, বড় লোকের বাড়ীতে বার বার যেতে আমার ভাল লাগে না বাপু।

একটু হাসিয়া হেমেন্দ্রনাথ বলিলেন, অবশ্য সে কথা সত্য, তবে বিশেষ কিছু বলবারও যো নেই কারণ রাণী তোমার বাল্যসখী, তারপরে রাজা প্রায়ই বেড়াতে আসেন, আমাদের সাহেবের সহিত তাঁর খুব ভাব। যদি না যাও, কোন রকমে সাহেবের কাণে কথাটা উঠবেই—রাজ অপমানে রাজ-রোষে চাকরীটি হারাব।

কণা বলিল, তোমার যা খুসি তাই কর।

সে দিনে রাজ প্রাসাদে গিয়া কণা মীরার দেখা পাইল।

রাজ প্রাসাদে সেদিন মহাউৎসব। রাজার বন্ধু আসিয়াছেন, পরিচিত আরও কয়েকটী মহিলা ও পুরুষ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। প্রাসাদে আজ কেবল আহারের সমারোহই নহে, নৃত্যগীতেরও ব্যবস্থা হইয়াছে।

সুন্দরী মীরাকে সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদে, হীরকালঙ্কারে বাস্তবিকই সেদিন রাণীর মত দেখাইতেছে। তাহার হাসিতে, কথায় নিমন্ত্রিতগণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিলেন।

কণা খানিকটা চুপচাপ একপাশে বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার মনে হইতেছিল বড়লোকের প্রাসাদের চেয়ে তাহার কুটিরই ভাল। এখানে থাকিতে তাহার প্রাণ কেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল।

হলঘরের বাহিরে বারাণ্ডা, অদূরে গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে। কণা রেলিংয়ে ভর দিয়া দূর নদীর পানে তাকাইয়া রহিল।

অন্যমনস্ক ভাবে সে বহু পুরাতন দিনের কথাই ভাবিতেছিল। মানুষ অবস্থার দাস বটে; কণার ধারণা ছিল অবস্থাবশে মানুষের বাহিরটা বদলাইয়া গেলেও অন্তর বদলায় না, আজ যেন তাহার সে ভুল ভাঙ্গিয়া গেল।

যে মীরার ধারণা ছিল অতি উচ্চ, সতী ধর্ম্মে যাহার অটুট বিশ্বাস ছিল, সে আজ পর পুরুষের বাহুতে ভর দিয়া অবাধে নৃত্য করে,—তাহার তাহাতে এতটুকু সঙ্কোচ, এতটুকু কুণ্ঠা যে মনের মধ্যে জাগে না ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়।

একি তুমি এখানে একা দাঁড়িয়ে রয়েছ যে কণা—

পিছনে মীরার কণ্ঠস্বর শুনিয়া কণা মুখ ফিরাইল, নৃত্যের পোষাক মীরার দেহে। শ্রান্ত ভাবে সে পোষাক খুলিতে যাইতেছে।

কণা বলিল, ঘরে অত গোলমাল আমি সইতে পারলুম না মীরা, তাই এখানে ফাঁকা জায়গায় একটু বেড়াচ্ছি।

মীরা বলিল, তুমি বেড়াও, আমি পোষাকটা খুলে আসি। সে চলিয়া গেল।

পার্শ্বে একটী ছোট ঘর, কণা বারাণ্ডায় এ সময় অপর লোকের আগমন সম্ভাবনা করিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘরটীর দেওয়ালে ছোট বড় অনেক ফটো, ইহার মধ্যে সম্মুখের একখানি কণার চক্ষু আকৃষ্ট করিল, সে তন্ময় ভাবে সেইখানির পানে তাকাইয়া রহিল।

চিত্রখানি একটী যুবকের, তাহার গাত্র অনাবৃত, সুপুষ্ট বিশাল বক্ষ তাহার দৈহিক শক্তির পরিচয় দিতেছে। সুন্দর মুখ, আয়ত চক্ষু জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে।

মীরা দরজায় দাঁড়াইতেই কণা মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ ফটো তুমি কোথায় পেলে মীরা ?

পাংশু মুখে মীরা বলিল, "এ কার ফটো কণা ?"

কণা বলিল, "এ তো আমার প্রেমদার ফটো। তোমার বাড়ীতে এ ফটো কি করে এল ?"

মীরা তেমনিই পাংশু মুখে বলিল, "আমি তো ঠিক বলতে পারিনে—"

বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়া মুখে একটু হাসি ফুটাইয়া

বলিল, ও, এই ফটোখানা? মনে পড়েছে আমিই ঝিকে বলেছিলুম এখানা আমার এই ঘরে রাখতে।

কণা জিজ্ঞাসুনেত্রের দৃষ্টি তাহার মুখের উপর রাখিয়া বলিল, "হঠাৎ এই আলগা-গা অসভ্য ভাবাপন্ন লোকটার ফটোর উপরে তোমার যে এত ভক্তি এলো মীরা? এদিকে তো আলগা গা লোকদের তুমি দেখতে পার না।"

মীরা হাসিয়া বলিল, "এ কি আর ভক্তির জন্যে রেখেছি কণা? আমাদের দেশের ছেলেরাও যে স্বাস্থ্য সম্পদে কম নয় সেই চেহারাটা দেখানোর জন্যেই রেখেছি। ছবি ছবিই, আসল মানুষ তো নয়।"

কণা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তবু যদি আসল মানুষটাকে দেখতে মীরা?"

একটু থামিয়া সে বলিল—"হতভাগা—সত্যিই বড় হতভাগা ছিলেন। আমার কাছে তাঁর হাতে লেখা একখানা ডায়ারী আছে আর কয়েকখানা ছবি আছে—"

ব্যগ্রভাবে মীরা বলিল, "তাই নাকি?"

একটু কাশিয়া লইয়া সে বলিল, "একবার দেখিয়ো তো। শুনেছি লোকটা নাকি অসম সাহসী, মৃত্যুকেও ভয় করে না। ডায়ারীখানা পড়লে অনেকটা জানতে পারা যাবে, কে—"

দাসী দরজার ওধার হইতে ডাকিল, "রাণী মা—"

সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া মীরা বলিল, "ওঘরে চল কণা, ওঁরা

ওখানে বসে আছেন, আমাদের এখানে থাকা উচিত মনে হয় না।"

কণার পাশে চলিতে চলিতে স্নিগ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "কাল সন্ধ্যের দিকে তোমার বাড়ীতে যাব, বিকেলে রাজার সঙ্গে একজায়গায় যাওয়ার কথা আছে। যদি পাঠিয়ে দিতে পারি বিকেলেই তোমার বাড়ী যাব, তুমি ফটো আর ডায়ারী ঠিক করে রেখো।"

কণা বলিল, "না হয় আমিই সন্ধ্যার সময় নিয়ে আসব।"

প্রেমদার গৌরবে কণার বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সে নিজেই আসিতে চাহিল।

মীরা তাহার স্কন্ধের উপর হাতখানা তুলিয়া দিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিল, "না ভাই, আমিই যাব। বাড়ীতে কি রকম দিনরাত গণ্ডগোল তা দেখতে পাচ্ছ তো" ?

হল ঘরে প্রবিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এ প্রসঙ্গে কথা বলা বন্ধ করিল।

চার

বাক্স খুলিয়া ডায়ারী ও কয়েকখানি ফটো বাহির করিতে করিতে কণা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল।

যাহাকে সে দেবতার মত ভক্তি করে—ভালবাসে তাহার এই ফটো কয়খানিকে সে পূজা করে, এই ডায়ারীখানিকে বুকের পঞ্জরের মত সে সযত্নে রক্ষা করিতেছে। আজ যে দেখিতে চায় সে শুধু খেয়ালের বশেই দেখিতে চাহিতেছে, তাহার মধ্যে শ্রদ্ধার ভাব কতটুকু আছে।

না, কণা এগুলি মীরার হাতে দিবে না।

পরমুহূর্ত্তে তাহার মুখের উপর একটু হাসির রেখা জাগিয়া উঠিল—মীরাই কি এই সামান্য জিনিস দেখিতে তাহার বাড়ীতে আসিবে? কাল হয় তো এমনিই কথাটা বলিয়াছিল, আজ সে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। বাহিরে তাহার সৌন্দর্য্যপূর্ণ বিশাল সংসার, ক্ষুদ্র গ্রামবাসী একটী যুবকের তুচ্ছ জীবনের তুচ্ছ ইতিহাস জানিতে সে কতটুকু উৎসুক হইয়াছে।

অফিস হইতে ফিরিয়া স্ত্রীকে বাক্স খুলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া

থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত হেমেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এ আবার কি ব্যাপার, বাক্সটী খুলে সামনে নিয়ে চুপচাপ থাকবার মানে কি ?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সন্তর্পণে ডায়ারী ও ফটো কয়খানি আবার বাক্সে তুলিয়া ফেলিয়া বাক্স বন্ধ করিতে করিতে কণা বলিল, "বাক্সটা খুলতেই প্রেমদার কথা মনে হয়ে গেল গো, তাই একবার দেখছিলুম।"

তাহার কণ্ঠস্বরের আর্দ্রতা অনুভব করিরা হেমেন্দ্রনাথ নিকটে সরিয়া আসিলেন, কণার মুখখানা তুলিয়া ধরিতেই তাহার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

প্রবোধের সুরে হেমেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ছিঃ কণা, আবার কাঁদছ ?"

চোখ মুছিয়া ফেলিয়া কণা বলিল, "না গো, আমি কাঁদছিনে, আমি খুব শুদ্ধ হয়েছি দেখছ না ? কাল রাণীর ঘরে প্রেমদার ফটোখানা দেখে—"

বলিতে বলিতে আবার তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

চকিতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল, "বাঃ, তুমিও যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে। সেই কখন দু'টো ভাত মুখে দিয়ে বেরিয়েছ, সারাদিনটা কেটে

গেছে। আর দাঁড়িও না, চল জামা জুতা খুলে জল খাবে।”

শুষ্ক হাসিয়া হেমেন্দ্রনাথ জুতা জামা খুলিয়া হাত মুখ ধুইয়া জল খাইতে বসিলেন।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, কণা আলো জ্বালিয়াছিল; হেমেন্দ্রনাথ পড়িতে বসিলেন, কণা দেশে পিসীমাকে পত্র লিখিতে বসিল।

“কণা—”

চমকাইয়া মুখ তুলিয়া কণা দেখিল—দরজায় দাঁড়াইয়া মীরা—।—

হেমেন্দ্রনাথ সসব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া বলিলেন, “আসুন।”

নমস্কার করিয়া হাসিমুখে মীরা বলিল, “আপনি এতটা ব্যস্ত হয়ে উঠবেন না হেমেনবাবু, আপনি বসুন।”

অভ্যাগতাকে গৃহমধ্যে বিছানার উপর বসাইয়া কণা বলিল, “তুমি ও ঘরে গিয়ে পড়াশুনা কর গিয়ে। কি বল মীরা উনি ও ঘরে—”

মীরা একটু হাসিয়া বলিল, “থাকলেনই বা এ ঘরে?”

হেমেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, “আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে। আপনি পাঁচ সাত মিনিটও থাকবেন, আমি ততক্ষণ সামনের বাড়ী হতে ঘুরে আসি। জরুরী কাজ আছে, কেবল কণাকে একা রেখে যেতে পারছি নে।”

কণা যে অল্পেতেই ভীতা হয় তাঁহার কথায় তাহাই বুঝাইল, কণাও বিনা প্রতিবাদে তাহাই মানিয়া লইল। হেমেন্দ্রনাথ একটু লাজুক প্রকৃতির লোক ছিলেন—বেশী কথা বলাও তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল, সেইজন্য তিনি সরিয়া যাইতে চান।

বারাণ্ডায় বাহির হইয়া জুতা পায়ে দিতে দিতে তিনি বলিলেন," "তুমি ততক্ষণ চা তৈরী কর কণা, আমি এখনি আসছি।"

মীরা বলিল, "ওঁকে বারণ কর কণা আমার জন্যে খাবার বা চা কিছুরই দরকার নেই। আমি চা মোটেই খাই নে।"

কণা বলিল, "আগে তো খুব চা খেতে মীরা।"

মীরা বলিল, বছর তিন চার হতে চা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি।

কণা বাহির হইয়া স্বামীকে কি বলিয়া দিয়া ফিরিল।

মীরা বলিল, "হেমেনবাবু কোথায় গেলেন?"

কণা বলিল, "সামনের বাড়ীতে গেলেম।"

একটু থামিয়া সে বলিল, "এই সন্ধ্যার পর একলা এলে। মীরা, রাজা বাহাদুর—"

বাধা দিয়া মীরা বলিল, এ বিষয়ে আমার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, কণা। আমি একা আসি নি, মোটরে এসেছি, মোটর

ফিরে গেছে, দ্বারোয়ান আছে, মিনিট পনের বাদে মোটর ফিরে আসবে বলে দিয়েছি, এর মধ্যেই আমি ডায়ারী আর ফটো কয়খানা দেখে নিতে চাই।"

কণা বলিল, "আমি কিন্তু বুঝতে পারছিনে মীরা এ গুলো দেখে তোমার কি হবে ?"

মীরা হাসিল,—আমি আমার স্বামীর মুখে তার নাম শুনেছিলুম কিন্তু পরিচয় পাইনি। তোমার আত্মীয় বলছ, তোমার কাছে তাঁর ডায়ারী ও ফটো আছে, আশা আছে তোমার কাছে সব শুনতে পাব। আমার একটী বন্ধু এঁর জন্যে—"

চমকাইয়া উঠিয়া কণা বলিল, "তোমার বন্ধু কে সে, নাম কি ?"

মীরা বলিল, "পরে বলব। আমায় আগে এগুলো দেখতে দাও, আমি যা জানি পরে বলব এখন।"

কণা বাক্স খুলিয়া ফটো কয়খানি ও ডায়ারীখানি বাহির করিয়া মীরার হাতে দিল। লণ্ঠনটা কাছে টানিয়া লইয়া মীরা ফটোগুলি দেখিতে লাগিল।

একখানি ফটোতে শীর্ণ অবস্থায় একটি যুবক,—মীরা বলিল, "ইনি তোমার—"

বাধা দিয়া কণা বলিল, "ইনিই প্রেমদা। জেলে যাওয়ার বছর দুই পরে তার এই ফটো।"

বিস্ফারিত চোখে মীরা বলিল, "জেলে—?"

কণা বলিল, "হ্যাঁ, প্রেমদা জেলে গিয়েছিলেন। সেখানেই এই ডায়ারী লিখেছেন।"

মীরা খানিক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পাঁচ

(ডায়ারী)

আন্দামান—

এখানকার কথা লিখব—কিন্তু কি লিখব? কেন এখানে এসেছি এ কথা বলব। এসেছি—জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে। বিশ্বের কিছুই আর ভাল লাগছে না।

এখানে এসেছি কতদিন—কবে? মনে পড়ছে সে মাস ছিল মার্চ্চ, বোধ হয় বিশ তারিখ। তারপর এটা কোন মাস, কত তারিখ ইচ্ছা করেই হিসেব রাখিনি, ইচ্ছে করেই সব ভুলে গেছি।

ওগো আমার প্রিয়া,—কি কঠিন হাসি যে সে দিনে হেসেছিলে তুমি, কি নিষ্ঠুর ভাবে চলে গেলে সে দিন

যে দিন আমার পূজার অর্ঘ্য তোমায় ডালি দিতে গিয়েছিলুম, সেই অর্ঘ্য পদাঘাতে ছড়িয়ে ফেলে দিতে তোমার এতটুকু ব্যথা লাগে নি?

কিন্তু প্রতিশোধ নাই কি? প্রকৃতির রাজ্যে ভগবানের সূক্ষ্ম বিচারের কেউ কাউকে আঘাত করে সগর্ব্বে মাথা তুলে বড় হয়ে থাকতে পারে না। একদিন আসবে যেদিন—ওগো গর্ব্বিতা নারী, যেদিন তোমার বুকে আমার বুকের এই হাহাকার গিয়ে ঠেকবেই।

রোজ অল্প অল্প অসুখ করছে। ডাক্তার বলছে, থাইসিস হতে পারে।

একদিন কি ছিলুম, আজ দেহের পরিণাম কি? বাঁচতুম—মানুষ হতেও পারতুম, কিন্তু বুক যে ভেঙ্গে গেছে।

কণার জন্যে ভাবনা হয়, হেমেনকে লিখেছি, কণাকেও লিখেছি। ওরা আমার কথা রাখবেই। কণাকে বলেছি যেন আমার কথা ভাবে। সে নারীর মত হেমেনকে যেন আঘাত না দেয়, আমার মত তার জীবনটাকে যেন বিষিয়ে সে না তোলে।

ডায়ারীর সব পাতাগুলি লেখায় পূর্ণ। মীরা সেখানা ক্রোড়ের উপর রাখিয়া মুখ তুলিল, লণ্ঠনের আলোর দিকে সে মুখ ফিরায় নাই। বলিল—"প্রেমরঞ্জনবাবু তোমার কে কণা, কি রকম ভাই?"

কণা উত্তর দিল, "প্রেমদা আমার পিসতুতো ভাই। কিন্তু আমি তাঁকে সহোদর ভাই বলেই জানতুম মীরা।"

মীরা বলিল, "আমাকে এঁর সব কথা বল না কণা, আমি আমার বন্ধুকে তা হলে সব কথা বলতে পারব।"

কণা তীব্র স্বরে বলিল, "আমি বুঝেছি মীরা, তুমি তোমার যে বন্ধুর কথা বলছ, তিনিই আমার দাদার শোচনীয় অবস্থার কারণ। তাঁর কাছে আমার কোন কথা তুমি জানাতে পারবে না এ প্রতিজ্ঞা যদি তুমি কর, তবে আমি তোমায় সব কথা বলতে পারি।"

মীরা বলিল, "তাই প্রতিজ্ঞা করছি, আমি এ সব কথা তাকে—সেই রাক্ষসীকে বলব না। আমায় বিশ্বাস করে সব কথা বল। আগে জিজ্ঞাসা করি তিনি আণ্ডামান হতে কবে ফিরে আসবেন ?"

শুষ্ক মুখে কণা বলিল, "বলছি—আগে শোন।"

ছয়

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কণা বলিল, "প্রেমদা যখন বি-এ পড়তেন তখন তিনি একদিন একটী মেয়েকে গুণ্ডাদের আক্রমণ হতে রক্ষা করেছিলেন।

উৎসুক ভাবে মীরা বলিল, "সে মেয়েটীর নাম তিনি তোমাদের কারোও কাছে করেন নি ?"

কণা বলিল, "সে মেয়েটী তাঁকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যায়, ক্রমেই তাদের পরিবারের সঙ্গে দাদার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে যায়।"

"আমার প্রেমদা দেশের সুসন্তান ছিলেন, সকল কাজে তিনিই আগে এগিয়ে যেতেন। তিনি বলতেন আগে দেহের শক্তি, দেহে শক্তি থাকলে তবে মনে জোর আসবে ; সেই জন্যে তিনি আগেই দৈহিক শক্তির উন্নতি করতে তৎপর হন।"

"সকল দিকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল, সকল কাজেই তাঁর হাত ছিল। এই জন্যে পুলিস দুই তিনবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে,

প্রত্যেক বারেই তিনি পনের দিন, একমাস, ছয় মাস পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন।"

"সেই মেয়েটী তাঁকে খুব উৎসাহিত করত। সে নিজেও তাঁর কাছে দেশহিতের মন্ত্র নিয়েছিল শুনেছিলুম। এর উৎসাহ বাণী পেয়ে তিনি আরও এগিয়ে যাচ্ছিলেন।"

বিবর্ণ মুখে মীরা বলিল, "মেয়েটীর নাম তবু—"

কণা বলিল, "শোন তারপর বলি। দেশমাতার যে সব ভক্ত দেশ পূজায় নেমেছিল তাদেরও জীবন ধারণের জন্যে অর্থের দরকার। প্রেমদা আমার জন্যে মাত্র হাজার টাকা রেখে বাকি সব এই মহাব্রতের জন্য দান করেছিলেন। এই রকম প্রায় সকলেরই অবস্থা।

"সিক্সথ্ ইয়ারে প্রেমদা ফেল হলেন, আর না পড়ে তিনি দেশের পূজায় মাতলেন।"

এই সময়ে যে ট্রেণ ডাকাতি হয়, তাঁরই মুখে শুনেছিলুম— সেই মেয়েটীর তাতে পরিপূর্ণ উৎসাহ ছিল। প্রেমদার টাকা সবই সেই মেয়েটীর কাছে থাকত।

"ঠিক এই সময়ে প্রেমদা লক্ষ্য করছিলেন মেয়েটি পাশ কাটানোর চেষ্টায় আছে। আগে কথা হয়েছিল সেই মেয়েটীর সঙ্গে মার্চ্চমাসে প্রেমদার বিয়ে হবে। মেয়েটীর মা নাকি এ প্রস্তাবে আনন্দের সঙ্গে মত দিয়েছিলেন।

তখন মার্চ্চ মাস, প্রেমদার বিয়ের প্রস্তাব করলে নাকি

অবলীলাক্রমে তাঁর মুখের ওপর জবাব দিয়েছি—যে জেল খেটেছে, ট্রেণে ডাকাতি করে, খুন করতেও পিছায় না, তাকে সে বিয়ে করবে না। দেখছো মীরা—কি রকম তার ব্যবহার।"

মীরার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—"ভয়ানক।"

কণা বলিয়া চলিল, "প্রেমদা প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। পরে তিনি আগাগোড়াই বলেছিলেন সে যদি তাঁকে বিয়ে না করে—তাঁর জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

"সে বলেছিল—জগতে আরও ঢের মেয়ে আছে।"

"এর পর যখন প্রেমদা শুনতে পেলেন সেই মেয়েটীর সঙ্গে একটী সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে বিয়ের সব ঠিক [illegible] হয়ে গেছে, এমন কি তিনি নিজের চোখে যখন দেখতে গেলেন মেয়েটী সেই সম্ভ্রান্ত লোকটীর হাত ধরে তাঁরই গাড়ী[illegible] বেড়াতে যায়, সিনেমায় যায়, তখন তিনি স্পষ্টই তাকে বল[illegible], তিনি তার ভবিষ্যৎ স্বামীকে বলে দেবেন—সে তাঁকে ক[illegible]নি প্রতারিত করেছে।"

"এর পর একটী দিন না যেতেই পুলিস তাঁকে ধরে ফেললে।"

"শুনতে বাকী রইল না যে সেই মেয়েটীই পুলিসকে অতি গোপনে তাঁর ট্রেণে ডাকাতির কথা জানিয়ে দিয়েছে।"

"বিচারে দণ্ড হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।"

"যেদিন তিনি যান সেদিন আমি এসেছিলুম। আমার হাতখানা ধরে তিনি কেবল নিঃশব্দে আমার পানে চেয়ে রইলেন। তাঁর পায়ে ধরে কাঁদলুম "সে মেয়েটীর নাম আমায় বলে দাও দাদা, আমি একটীবার তাকে দেখব।"

"দাদা একটু হেসে বললেন, "তার নাম জেনে আর কি করবি কণা? আমি শুনেছি তার ভদ্রলোকটীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে। যাওয়ার বেলা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে যাচ্ছি তার বিবাহিত জীবন সুখময় হোক, অতীতের কোন কথা যেন তার মনে না থাকে।"

কণা অন্যমনস্ক ভাবে কোন দিকে তাকাইয়া রহিল; যদি সে তখন মীরার মুখের দিকে চাহিত তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইত; মীরার মুখখানা তখন শুষ্ক শবের মতই বিবর্ণ-মলিন হইয়া উঠিয়াছিল।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কণা বলিল, "তারপর দাদা চলে গেল। মাস কত পরে তাঁর পত্র পেলুম। তুমি জানো—আগে আমি বলেছিলুম বিয়ে করবনা। কিন্তু দাদার পত্র পেয়ে আমার মত বদলে গেল, আমি বিয়ে করলুম।"

মীরা রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তোমার দাদা কয়বছরের জন্যে আণ্ডামানে গেছেন?"

কণা বলিল, "সমস্ত সংবাদ পত্রেই তো সে খবর প্রকাশ হয়েছিল, তোমার পড়বার অবকাশ হয়নি, মীরা?"

মীরা মাথা নাড়িল মাত্র—

কণা অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল "চৌদ্দ বছর।" মীরা লণ্ঠনের কলটা একবার ডাইনে একবার বামে ঘুরাইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে আলোর দীপ্তি বাড়িতেছিল কমিতেছিল।

"তিনি কতদিন বাদে ফিরে আসবেন ?"

কণা হাসিল—সে হাসি কান্নারই রূপান্তর মাত্র। "আসবেন না। দেশ মাতৃকার ভক্ত ছেলে দেশ মায়ের কোলে আর ফিরবেন না। একটী নারী তাঁর মনুষ্যত্ব নষ্ট করেছিল, রাজ-রোষ তাঁর প্রাণ নষ্ট করেছে। আমার প্রেমদা ঠিক এক বছর আগে এই মার্চ্চ মাসের এই দিনে স্বর্গ পথের যাত্রী হয়েছেন।"

দপ করিয়া আলোকটা একবার জ্বলিয়াই নিভিয়া গেল। সেই গাঢ় অন্ধকার পূর্ণ ঘরে একটী মাত্র বুকফাটা গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস শুনা গেল।

খস খস শব্দ শুনিয়া কণা ডাকিল—"মীরা—"

উত্তর পাওয়া গেল না।

দেশালাই খুঁজিয়া লইয়া কণা আলো জ্বালিল, শূন্য, শূন্য, মীরা নাই,—ডায়েরী ও ফটোগুলিও সেখানে নাই।

পথে মোটরের হর্ণ শুনা গেল, মোটরখানা ছুটিয়া চলিয়া গেল।

কণা আবার ডাকিল—"মীরা—"

উত্তর পাওয়া গেল না।

চিরকালের ঘৃণিত সেই দাসীবৃত্তিই স্বীকার করিয়া সীতা আসিয়া রাধানাথবাবুর দুয়ারে যেদিন দাঁড়াইয়াছিল, সে বড় বেশী দিনের কথা নয়।

দিন যে তাহার কাটিতে চাহিতেছিল না। চতুর্বিংশতি বর্ষীয়া যুবতী সে, পূর্ণযৌবনে দেহখানি তাহার ভরিয়া গিয়াছিল। স্বামী বছর দুই আগে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিল, তখনও সে বুকে বল ধরিয়াছিল কারণ কোলে ছিল, আটমাসের শিশুপুত্রটী। ভাঙ্গিয়া পড়িলেও সন্তানটীর পানে চাহিয়া তাহাকে উঠিতে হইয়াছিল, আবার কাজে হাত দিতে হইয়াছিল। দুঃসহ স্বামী শোকও যখন সহিয়া আসিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে তাহার বুকের ধন—সেই বড় দুঃখের সান্ত্বনারধন পুত্রটীও ইহলোক ত্যাগ করিল।

সীতা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে হয় ততক্ষণ উঠিতেই হইবে। সীতাকেও আবার উঠিতে হইল, ছেলের জন্য, স্বামীর জন্য কাঁদিয়া তবুও তাহাকে উদর পূরণ করিতে হইল।

তবুও সে ছিল, তবুও যে তাহাকে যথার্থই পরের গৃহে গিয়া দাসীবৃত্তি করিতে হইবে যাহা সে জানিত না। কিন্তু অবশেষে যখন দশজনের কৃপাদৃষ্টি তাহার উপর পড়িল তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে গৃহত্যাগ করিতেই হইল। আর একবার শেষবার স্বামীপুত্রের জন্য আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া সে গৃহ হইতে বাহির হইল।

গ্রাম ছাড়িয়া একেবারেই সে উঠিল গিয়া সহরে। গ্রামে থাকিতে তাহার সাহস হইতেছিল না, তাই সে গ্রাম ত্যাগ করিল।

সে প্রার্থনার বাণী কি সহজে তাহার মুখ হইতে বাহির হয়? বুক যেন ফাটিয়া যায়, চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়ে! তবুও তাহাকে প্রার্থনা করিতে হইল, তবুও তাহাকে দাসীর কাজ লইতেই হইল।

এখানে সে একটি জিনিস পাইল, এই বুক জুড়ানো জিনিস—রাধানাথবাবুর একটী মাত্র ছেলে—মাত্র দেড় বৎসর বয়স তাহার, নাম কৃষ্ণনাথ।

ছেলেটীকে রাখার ভার পড়িল সীতার উপর। এই ছেলেটীকে পাইবামাত্র সীতার বুকখানা ধড়াস করিয়া উঠিল, অজ্ঞাতে তাহার দুই চোখের কোল বহিয়া কয়েকবিন্দু জল ঝরিয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিয়া কৃষ্ণকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল—আঃ।

উত্তপ্ত বুকখানা তাহার জুড়াইয়া গেল। নিদাঘ তাপিত মাঠের মাঝখানে বৃষ্টি পড়িলে তাহার যেমন উত্তাপ ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়, সীতার ও তাহাই হইল। সে কৃষ্ণকে বুকের মধ্যে একবার চাপিয়া ধরিয়া আর তফাৎ করিতে পারিতেছিল না। তাহার খোকাকে হারাইয়া পর্য্যন্ত সে কেবল ব্যর্থতার হাহাকার নিয়াই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, আজ তাহার মনে হইল খোকাকে সে ফিরিয়া পাইয়াছে।

"আঃ, যাদুরে আমার—"

সীতা চোখের জলে ভাসিয়া অজস্র চুম্বনে কৃষ্ণের ছোট গণ্ড ললাট পূর্ণ করিয়া ফেলিল।

কৃষ্ণের মা ছিল না, সৎমায়ের কাছে সে মানুষ হইতেছিল। সে জন্মিবার কয়দিন বাদেই তাহার মা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। মাসখানেক বাদেই—শুধু এই মাতৃহীন সন্তানকে প্রতিপালন করিবার জন্যই রাধানাথবাবু অনুমতীকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন।

দেখা যায়—পরের ছেলেকে—অর্থাৎ যাহার সহিত কোনও সম্পর্ক নাই তাহাকে মেয়েরা আদর করিতে পারে, কিন্তু যত গোল বাধে এই সতীনের ছেলেটার বেলায়। স্নেহপরায়ণ যে বুক, তাহার সেই অফুরন্ত স্নেহ ও সতীনের ছেলে বা মেয়ের

বেলায় একেবারে নিঃশেষ হইয়া উঠে। ইহাদের মৌখিক আদর করিতে হয়, ভালবাসা দেখাইতে হয়, কিন্তু বুকের মধ্যে কেমন যে একটা হিংসার জ্বালা থাকে তাহা স্পষ্ট বলা যায় না। স্নেহের আবরণের আড়াল দিয়া রাখিলেও সময় সময়—আগ্নেয়-গিরি যেমন অগ্ন্যুৎপাদন করে, এই হিংসা বহ্নিটাও তেমনি অগ্ন্যুৎপাদন করিয়া থাকে।

অনু ছেলে মেয়ে খুবই ভাল বাসিত, কিন্তু এই হতভাগ্য ছেলেটার পানে তাকাইয়া তাহার স্নেহ একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। একদিন একটা আদরের কথা সে বোধ হয় আজ দেড় বৎসরের মধ্যে মুখে আনে নাই।

কৃষ্ণ এ যাবৎ দাসীর কাছেই মানুষ, কিন্তু তাহারা বেতন লইয়া কাজ করিতে আসিয়াছে, তেমন ভাবেই কাজ করিয়া যাইত। শিশু সীতার বুকের নিঃস্বার্থ ভালবাসা পাইয়াছিল, তাই সে তাহার মলিন রোগশীর্ণ মুখে সেই তৃপ্তিপূর্ণ হাসিটিই বিকশিত হইল।

দুই

সে দিন অনুমতীর চোখ হঠাৎ কৃষ্ণের উপর পড়িল, বিস্ময় বিরক্তিতে সে বলিয়া উঠিল, আ মর ছেলেটা মোটা হচ্ছে দেখ না! খুব করে খাওয়াস বুঝি ঝি?

সীতা একটু হাসিয়া বলিল "না, খাওয়া এত কি দেই? আপনি যা বলে দেন তাই ত দেই।"

সন্দিগ্ধ ভাবে মাথা নাড়িয়া অনুমতী বলিল "উঁহু, ভাল মন্দ ঢের খাচ্ছে, নইলে কি অমন চেহারা হয়?"

তাহার সে কথায় সীতার নখ হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু সে খুব সামলাইয়া লইয়া বলিল—ভাল মন্দ কি খেতে পাবে মা, আপনি যা হাতে করে দেন তাই খেতে দেই, তার বেশী আর কি পাব?

অনু তাহার কথায় একটু বিরক্ত হইয়া উঠিল; সে মুক্ত চক্ষে চাহিয়া দেখিল, হতভাগ্য কৃষ্ণ এই সাথিটির বড় অনুগত হইয়া উঠিয়াছে। দাসীটাও তাহাকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসে। অনুর মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, সে ধরিয়া লইল, ভবিষ্যতে ছেলেটার অদৃষ্ট বড়ই মন্দ হইয়া যাইবে। এখনই সে একটা দাসীর এত বাধ্য, ভবিষ্যতে এই দাসীটাই তো তবে কর্ত্তৃস্থানীয়া

হইবে আর এ যে ছেলেকে একেবারে বহিয়া যাইতে দেওয়া।

অনু এবার হইতে কড়াদৃষ্টি রাখিতে সঙ্কল্প করিল।

সেদিন সীতা কৃষ্ণকে বেড়াইতে লইয়া যাইবে, একটু ভাল পোষাকের দরকার, তাই সে অনুর কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

স্বামীর জন্য সে তখন জলখাবার গুছাইতেছিল, সীতার মুখ দেখিয়াই বুঝিল সে প্রার্থিনী হইয়া আসিয়াছে। মুখখানা একটু অন্ধকার করিয়া বলিল—কি চাই?

সীতা উত্তর করিল—খোকার পোষাক···

মুখ ঘুরাইয়া অনু বলিল—পোষাক টোষাক এখন হবে না বাবু, বেড়াতে নিয়ে যাবে, অমনি নিয়ে যাও।

সীতা তাহার মুখখানার পানে চাহিয়া একটু ব্যথা পাইল, নিঃশব্দে সে ফিরিয়া গেল। আর বেড়াইতে লইয়া যাইবার আগ্রহ তাহার একটুও রহিল না। কৃষ্ণ বার কত আবদার করিল, কিন্তু সীতা নড়িল না।

শ্রীশবাবুকে এক সময় অনু বলিয়া রাখিল, দেখ নূতন ঝির বয়স্ খানা বড় ভাল বোধ হয় না।

নিতান্ত নিশ্চিন্তচিত্তে সিগারেট টানিতে টানিতে শ্রীশবাবু বলিলেন—কেন?

অনু সহজে রাগিয়া উঠিত, রাগিয়া বলিল—কেন তা জানিনি। ও খোকাকে কিরকম ভালবাসা দেখায় তাতে আমার ভারি সন্দেহ হয়! হয় তো এক দিন খোকাকে নিয়ে পালাতে ও পারে, এটা তো বিচিত্র নয় কিছু, আর এ রকম কাণ্ড আলহারি তো ঘটছে। ওই যে সে-বছর নাকি এই পাশের বাড়ীর অঘোরবাবুর একটী ছেলে কোথায় চলে গেছে, আর তাকে পাওয়া যায়নি, এরকম ঘটতেই বা কতক্ষণ?

শ্রীশবাবু অঙ্গুলিদ্বারা সিগারেটের ছাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল—না এ ঝিটি বেশ ভাল। চরিত্র ও ভারী নরম। এতে বোঝা যাচ্ছে সে যথার্থই ভাল বংশের মেয়ে, তুমি মনটাকে অত নীচ করো না অনু, লোককে অত খারাপ ভাবতে নেই।

অনু চুপ করিয়া গেল, কিন্তু এই সুন্দরী দাসীর জন্য মনের মধ্যে সে একটা বেজায় রকম অশান্তি ভোগ করিতে লাগিল।

তিন

আশ্চর্য্য যে কৃষ্ণ ছেলেটী অনুর একটা কথাও শোনে না। সীতা যাহা বলে সে সব কেমন সে শোনে, কিন্তু অনু একটা বলিলে সে পলায়ন করে, অথবা স্পষ্ট মাথা নাড়ে। রাগে অনুর বুকটা ভরিয়ে উঠে, তাহার এক এক সময় এই ছেলেটাকে খুব খানিকটা প্রহার দিবার ইচ্ছা মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিত। পারিত না কেবল চক্ষু লজ্জায়, আর এ চক্ষু লজ্জাটা শুধু সীতার জন্যই। সীতাকে কিছুতেই সে সাধারণ দাসী শ্রেণীর মধ্যে ফেলিতে পারিতেছিল না—এই হইয়াছিল তাহার বড় মুস্কিল, আর ঠিক এই জন্যই সে সীতাকে দূর করিবার জন্য বড় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

সে দিন সীতা কার্য্যান্তরে বাহিরে গিয়াছিল, কৃষ্ণ সেই অবসরে গৃহে ঢুকিয়া তাহার আলমারীর কাঁচের [illegible] ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া একাকার করিয়াছিল।

অনু গৃহে প্রবেশ করিয়াই এই ব্যাপার দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল; বিস্ময়ের প্রথম বেগটা কাটিয়া যাইতেই সে কৃষ্ণকে ধরিয়া ক্রুদ্ধভাবে খুব গোটাকতক কীল চড় বসাইয়া দিল।

শিশুর আর্ত্ত চিৎকারে সীতা ছুটিয়া আসিল, দরজার উপর দাঁড়াইয়া সে স্তম্ভিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল—সে কি প্রহার! অভাগা শিশু কাঁদিতেও পারিতেছিল না, এক একবার শুধু ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল—মা—মাগো—

অনু দরজার উপর দণ্ডায়মানা সীতার পানে একবার চাহিল, তাহার সমস্ত শক্তি যেন অন্তর্হিত হইয়া আসিল ; সেই অপহৃত-প্রায় শক্তি শেষ একবার এক করিয়া সজোরে কৃষ্ণকে একটা ধাক্কা দিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল "দূর হ হতভাগা, তোর কি মরণ নেই ? এত লোক মরে, তুই মরতে পারিস নে ?"

সে ধাক্কায় আড়াই বৎসরের শিশু ছিটকাইয়া আসিয়া পড়িল, সীতার পায়ের কাছে, উপুড় হইয়া সে পড়িয়া গেল। সীতা শুধু চাহিয়া রহিল, একটা কথাও তাহার মুখে ফুটিল না।

গজ গজ করিতে করিতে অনু বাহির হইয়া গেল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সীতা শিশুর পাশে বসিয়া পড়িল—বাবা, কৃষ্ণ, চাঁদ আমার—"

তাহার দু'চোখ বাহিয়া দরদর ধারে অশ্রু ছুটিল, তাহার নিজের মনে সেই শিশুটীর কথা জাগিয়া উঠিল, সে কোনমতেই নিজেকে সামলাইতে পারিল না।

কৃষ্ণ তাহার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। আহা, ললাট তাহার ফাটিয়া গিয়াছে, দরদর রক্তধারা ঝরিয়া

পড়িতেছে। শিহরিয়া উঠিয়া সীতা তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

পার্শ্ববর্ত্তী ডাক্তার রতিনাথবাবুর নিকট হইতে কৃষ্ণের ললাটের ঔষধ দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধাইয়া লইয়া যখন সে ফিরিতেছিল, তখন দেখা হইল শ্রীশবাবুর সঙ্গে। "ওকি ঝি, খোকার কপালে কি হল?

সীতা উত্তর দিল না, দিতে পারিল না।

ক্রুদ্ধ শ্রীশবাবু বলিয়া উঠিলেন "জানো তুমি, শুধু খোকাকে দেখবার জন্যই তোমায় রাখা হয়েছে। তোমার অসাবধানতায় ছেলে এমনি করে পড়ে গেল যে তার মাথা ফেটে গ্যাছে? এ রকম ফের যদি দেখি—

কৃষ্ণ অধর স্ফীত করিয়া কি বলিতে গেল, সীতা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল। না, কোন কথা না, একটী বর্ণও বলা হইবে না, কিছু শুনানো হইবে না। যে পিতা সন্তানের পানে চান না, তাঁহাকে জোর করিয়া শুনাইয়া কি লাভ? তাঁহার কি উচিত নয় মাতৃহারা ছেলেটীর সব খবর গ্রহণ করা? বৃথা অভিমানে সীতার বুকখানা ফুলিয়া উঠিল, সে তাই কিছুই জানাইল না, প্রাণপণে সত্যকে গোপন করিয়া গেল।

চার

কৃষ্ণের আঘাতটা খুব গুরুতরই হইয়াছিল, তাই সেই দিন তাহার জ্বর আসিয়াছিল। সে জ্বর ছাড়িল না ; ক্রমে তাহা বিকারে পরিণত হইল।

সীতা ছায়ার ন্যায় বসিয়া, তাহাকে কোলে লইয়া সে নিষ্পলকে তাহার মুখপানে চাহিয়া, একমুহূর্ত্ত তাহাকে ছাড়িয়া সে নড়িতে পারিতেছিল না। কি একটা অজ্ঞাতভাবে তাহার হৃদয়খানা ভরিয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীশবাবু পাগলের মত ছুটিয়া বেড়াইতেছিলেন, ডাক্তারকে— আর সকলকে শুনাইয়া দিতেছিলেন—কেবল এই দাসীর অসাবধানতাতেই এইটা ঘটিল। সীতার জন্যই তিনি কৃষ্ণকে হারাইতে বসিয়াছেন। সীতার সম্মুখে তিনি আবার যখন স্পষ্ট এ কথা বলিলেন তখন সীতা একেবারে পাষাণের মতই নিশ্চল হইয়া গেল।

সেই জ্বলন্ত সত্য কথাটা তাহার ওষ্ঠাগ্রে ভাসিয়া আসিল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে তাহার দৃষ্টি পড়িল অনুর প্রতি। সে চোখে সে যে দৃষ্টি দেখিল, তাহাতে সত্য কথাটাকে প্রকাশ করিতে তাহার বুকটা টনটন করিয়া উঠিল, সীতা নীরবে শুধু মাথা নত করিল, কথা কহিল না

হোক, তাহার নামে যত অপবাদ আসে আসুক। তাঁহার সহিত সম্পর্ক খোকার, আর কাহারও নয়। খোকা যদি যায়, সব সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়া সে বিদায় লইবে, আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকিবে না। সে চলিয়া গেলেই সব মিটিয়া যাইবে, কিন্তু যদি সত্য প্রকাশ হয়, সেটা স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে যে দূরত্ব আনিয়া ফেলিবে তাহা আর এ জীবনকালেও দূর হইবে না। তারিণী যত বড়ই প্রিয়াই থাক, তথাপি সে ঘৃণার চোখে পড়িবেই, কারণ জগতে সব চেয়ে পুত্র স্নেহই শ্রেষ্ঠ !

সীতার ঘর অবধি নির্ব্বিবাদে নিজের মাথাতেই তুলিয়া লইল, শ্রীশবাবুর ঘৃণা সে নীরবে বহন করিতে লাগিল, অনুকে সে অক্ষত রাখিল।

শেষ সেই দিন যে দিন ক্ষুদ্র শিশু কৃষ্ণের সব ফুরাইয়া গেল, শুষ্ক গোলাপটীর মতই সে বিছানাপরে পড়িয়া রহিল। শোকে মুহ্যমানা সীতা তাহার পাশে পড়িয়া। আজ আবার নূতন করিয়া তাহার বুকে পুত্র শোক জাগিয়া উঠিল, তাহার বুক একেবারেই ধসিয়া গেল।

হতভাগ্য পিতা প্রাঙ্গনে পড়িয়া ছিলেন, তাঁহার মনে ধারণা হইয়া গিয়াছিল, সীতার জন্যই তাঁহার এই সর্ব্বনাশটা ঘটিয়া গেল। তিনিও এক সঙ্গে বিগতা প্রাণ প্রিয়তম পত্নী ও প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র শোক হৃদয়ে অনুভব করিতেছিলেন। ওঃ,

এই রাক্ষসী তাঁহার কি সর্ব্বনাশটাই না করিল, তাঁহার কৃষ্ণ, তাঁহার বড় প্রিয় খোকা।

খোকাকে সীতার বুক হইতে ছিনাইয়া লইয়া প্রতিবাসীরা গেল, সীতা সেদিন উঠিল না, চাহিল না, তেমনি ভাবে পড়িয়া রহিল।

পরদিন প্রভাতে সে যখন উঠিল, তখন তাহাকে দেখিলে আর চেনা যায় না। একটা দিন ও একটা রাত যেন দশ-বৎসরেন দাগ রাখিয়া গিয়াছে। অনুর নিকটে গিয়া শুষ্ক কণ্ঠে সে বলিল—আমি যাচ্ছি।

বিস্মিতা অনু বলিল "কোথা যাচ্ছ?"

উদ্বেলিত অশ্রু কোন মতে চাপিয়া রুদ্ধকণ্ঠে সীতা বলিল, "যেখানে দু চোখ যায় সেখানে।"

কৃতজ্ঞতায় অনুর হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল, সে বলিল, "না, আমি তোমায় যেতে দেব না, আমার কাছেই তোমায় রাখব। তুমি আমার বোনের মত কাজ করেছ, আমার কত বড় অকাজটা তুমি নিজের বলে মাথায় নেছ। আমি তোমায় ছাড়ব না সীতা, আমার বড় বোনের মত তোমায় আমার কাছে রাখব। বল—থাকবে আমার কাছে?"

অন্যমনস্কা সীতা ভাবিতেছিল তাহার কথা। ঠিক তেমনিই, আহা, ঠিক তেমনই হাসিত, তেমনিই করিয়া তাহার গলা

দুইটী কোমল বাহুদ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার গণ্ডের উপর মুখখানি রাখিয়া তেমনিই খিল খিল করিয়া হাসিত। কোথায় সে—কোথায় তাহারা দুটিই আজ কোথায়? মা বলিয়া ডাকিয়া যাহারা তাহাকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইয়াছিল—তাহারা আজ কোথায় গেল?

অনু আবার যখন বলিল, "বল থাকবে তুমি— ?"

তখন সে চমকাইয়া উঠিল, শুষ্কমুখে বলিল "না, না, আমি থাকব না।"

সে চলিয়া যাইতেছে, শুনিয়া শ্রীশবাবু তাহার মাহিনা দিতে আসিলেন, সীতা কিছুতেই লইল না।

চোখের জল অঞ্চলে মুছিতে মুছিতে সে বাড়ী ত্যাগ করিল। যেমন রিক্তহস্তে সে আসিয়াছিস, তেমনিই চলিল, আসিয়াছিল একটীর বুক-ভরা স্মৃতি লইয়া; আজ লইয়া চলিল, আর একটীর চির বিরহের স্মৃতি বহিয়া।

গুলুয়া যখন বদলি হইয়া হাবড়া ষ্টেশনে আসিল তখন তাহার সঙ্গে আসিল পত্নী রোমলা।

সুদূর ছত্রিশগড় হইতে তাহারা বহুকাল পূর্ব্বে বাংলাদেশে আসিয়াছে, বাংলা ভাষা শিক্ষা করিয়াছে; বাঙ্গালা চালচলন লইয়াছে। রোমলা কখনও কখনও বাঙ্গালীর মত কাপড় পরে, বাঙ্গালীর মত সংসারযাত্রানির্ব্বাহ করে।

রোমলা স্বামীর বিবাহিতা পত্নী, ইহাও তাহার নিকট বড় গর্ব্বের কথা ছিল, এবং নিজেকে সে অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী বলিয়া জ্ঞান করিত।

যদিও গুলুয়া রোমলার স্বামী হইবার উপযুক্ত ছিল না; এবং যে কেহ দেখিত সেই মুক্তকণ্ঠে একথা বলিত তথাপি রোমলা কিছুতেই একথা মানিয়া লইতে চাহিত না। সে তাহার চোখ দিয়া দেখিত তাহার স্বামীর মত রূপবান দুনিয়ায় হয়ত আর কেহ নাই; আর স্বামীর গুণ,—তাহার অবর্ণনীয়।

লোকে গুলুয়াকে শতমুখে নিন্দা করিত কারণ সে ভারি কোপন প্রকৃতির ছিল, পয়সা তাহার গায়ের রক্ত ছিল। কিন্তু

শুধু এই মাত্র, ইহা ছাড়া আর কিছু বলার ক্ষমতা লোকের ছিল না। রোমলার সম্মুখে এই জ্বলন্ত সত্যকথাগুলি বলিলে সে স্পষ্ট অস্বীকার করিতে পারিত না। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে মানিয়া লইত—গুলুয়া কৃপণ বটে কিন্তু তাহার অবস্থায় কৃপণ হওয়াই স্বাভাবিক, কেন না সে যাহা বেতন পায় তাহা অতি সামান্য, বার টাকা মাত্র। রোমলা ঘরে যথেষ্ট খাটে, তথাপি ইহাতে সঙ্কুলান করিতে পারা যায় না। এ অবস্থায় তাহার কৃপণতা করা ছাড়া উপায় কি? আর যে অতিরিক্ত খাটনি তাহার তাহাতে মানুষে গোপন প্রকৃতির হইবে না ত কি?

গুলুয়া তাহাকে যথার্থ ভালবাসিত, একদিনও সে রোমলার গায়ে হাত তুলে নাই। বিবাদ বিসম্বাদ হইলেও শীঘ্রই তাহা মিটিয়া যাইত, কেহ কাহারও মুখভার দেখিতে পারিত না।

প্রথম জীবনে গুলুয়া বড় তাড়ি খাইত, তাহার পর রোমলার সাহচর্য্যে তাহার উপর হইতে তাড়ির প্রভাব কমিয়া গিয়াছিল। ইদানিং সে কদাচিৎ তাড়ি পান করিত; তাহাতে রোমলা বিশেষ কিছু আপত্তি করিত না।

হাবড়ায় আসার পূর্ব্বে তাহারা দমদমায় ছিল। সেখানেও গুলুয়া তাহার সংযত জীবনযাপন করিয়াছিল, কিন্তু হাবড়ায় আসার পরে তাহার জীবনটা কিছু উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল।

এখানে ছিল তাহাদেরই দেশের পরিচিত লোক দশরথ এবং তাহার সঙ্গিনী ইবনি।

ইবনি বেয়ারবাসিনী, অনেকগুলি সঙ্গীর পর সে দশরথকে সঙ্গী করিয়া এখানে বাস করিতেছিল। দশরথ গুলুয়ার উপরে কাজ করিত, বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন করিত এবং বাবলা মুল্লুকের অজস্র প্রশংসা করিত। দেশে থাকিতে একবেলার ভাত, পাঁচ বেলা এবং কেবল মাত্র লবণ উপচারে তুলিতে হইত, এখানে মাছ, ডাল, তরিতরকারী, রুটী, ঘি, কিছুরই অভাব ছিল না। পায়ের উপর পা তুলিয়া দিয়া সে টুলে বসিয়া কুলী খাটায়, তাড়ি খাইয়া বেহুঁস হয়। প্রতি সন্ধ্যায় তাহার ঘরে বেসুরো বাজনা বাজে, ইবনির কর্কশকণ্ঠ তাহার সহিত মিশিয়া যায়।

গুলুয়া রোমলাকে ধরিল, তুই একদিন গান গেয়ে ওদের শুনিয়ে দে রোমলা, ওরা দেখুক তুই কেমন গান গাইতে পারিস।”

রোমলা বলিল, “ধেৎ তা হবে না।”

গুলুয়া বলিল, “কেন হবে না?”

রোমলা বলিল, “আমি কি ভাল গান গাইতে পারি?”

গুলুয়া হাসিল, পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া বলিল, “না, না তুই পারবি কেন? ইবনি গাইতে পারে তুই পারিস নে।”

কিন্তু এই স্থানে আসার পর হইতে গুলুয়া যে অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে, তাহা রোমলা বেশ বুঝিতে

পারিয়াছিল, এবং সে বিলক্ষণ উৎকণ্ঠিতাও হইয়া উঠিয়াছিল। হাবড়া হইতে অন্য কোথাও যাইতে পারিলে সে এখন যেন বাঁচিয়া যায়। ভগবানের কাছে সে দিনরাত গুলুয়ার অন্যত্র বদলি হওয়ার প্রার্থনা করিতে লাগিল।

সেদিন যখন টলিতে টলিতে রাত দুপুরে গুলুয়া ঘরে ফিরিল তখন রোমলা অশ্রুসিক্ত দুইটী নয়ন মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র তাহার মুখের উপর তুলিয়া ধরিল। গুলুয়ার আকৃতি দেখিয়া সে কিছুতেই হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিতে পারিল না, তাহার চোখ ফাটিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তাহার চোখের জলে গুলুয়ার সব নেশা যেন ধুইয়া গেল, সে রোমলার হাতখানা টানিয়া লইয়া রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই কাঁদছিস কেন রোমলা? আমি মদ খেয়েছি বলে তোর ভারি কষ্ট হচ্ছে,—না? আজ সর্দ্দারের ওখানে ওরা কিছুতেই ছাড়লে না, জোর করে মদ খাইয়ে দিলে। তোর পা ছুঁয়ে বলছি আর মদ খাব না, তুই দেখে নিস।

রোমলা বলিল, "সত্যি বলছিস?"

তাহার কোলের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িয়া গুলুয়া শ্রান্তকণ্ঠে বলিল, "তুই দেখে নিস রোমলা, তোর কাছে গুলুয়া মিছে কথা বলছে না।"

কিন্তু সেই কি একদিন?

রোমলার সুখ সৌভাগ্য ইবনির বড় অসহ্য বোধ হইয়াছিল, সে তাই "বিহাতিয়া" নারীর তেজ দর্প দূর করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছিল। সে সর্দ্দারের সঙ্গিনী হইয়াও রোমলার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই,—এ দুঃখ তাহাকে বড় পীড়ন করিতেছিল। রোমলার সর্ব্বনাশ করিতে সে নিজের যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতেও পশ্চাৎপদ হইত না।

ক্রমেই গুলুয়ার অধোগতি দেখিয়া রোমলা একদিন মনের কষ্টেই বলিয়া ফেলিল, "ভগবান তোকে কবে যে এখান হতে অন্য ঠাঁই বদলি করে দেবেন, তাই আমি প্রার্থনা করছি। অন্য ঠাঁই গেলে তোরও ভাল হবে আমারও ভাল হবে।"

রোমলা যে আজকাল বড় বেশী রকম কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা গুলুয়া লক্ষ্য করিতেছিল। রোমলার দুঃখের ভাত সুখে মুখে তুলিবার প্রধান অন্তরায় হইয়াছিল ইবনি। গুলুয়ার নানা দোষ বাড়িয়া যাওয়ায় খরচও বেশী রকম বাড়িয়াছিল, রোমলার অদৃষ্টে কোন দিন অর্দ্ধাহার কোনদিন অনাহার চলিতেছিল। পরণের কাপড় ছিড়িয়া প্রায় অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে গুলুয়ার সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশ ছিল না। বেতন ছাড়া সে উপরি যাহা দু পয়সা পাইত তাহার একটাও দাঁড়াইতে পারিত না। গুলুয়া সবই দুইহাতে উড়াইয়া দিতে লাগিল।

প্রতিবাদী লছমন গুলুয়ার পত্নী সৌভাগ্যে তাহাকে হিংসা করিত। রোমলা এই লোকটাকে আদৌ দেখিতে পারিত না, ইহার চক্ষে লালসাময় দৃষ্টি দেখিতে পাইয়াছিল যাহাতে তাহার সমস্ত অন্তরে তীব্রজ্বালা আনিয়া দিয়াছিল। লছমন সর্ব্বদা রোমলার অনুসরণ করিত, তাহার কাজ করিয়া দিতে পাইলে নিজের জীবন ধন্য জ্ঞান করিত, তাহার সহিত কথা কহিতে পাইলে সে চরিতার্থ হইয়া যাইত। রোমলা তাহাকে জড়াইয়া ধরিত।

সেদিন লছমন যখন জানাইল তাহার স্বামী ইবনিকে লইয়া উন্মত্ত হইয়াছে তখন রোমলার বুকের মধ্যে আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। অনেকদিন হইতে সে স্বামীকে মনেই করিয়াছে, লছমন তাহাকে দেখাইয়া দিল তাহার স্বামী অন্যাসক্ত, তাহার অদৃষ্ট ভাঙ্গিয়াছে।

সেই রাত্রে গুলুয়া যখন বাড়ী ফিরিল তখন রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে। সে সেদিন এত মদ খাইয়াছে যে দাঁড়াইতে পারিতেছিল না।

রাগ করিয়া রোমলা সে দিন ভাত রাঁধে নাই। কেন কিসের জন্য সে প্রত্যহ স্বামীর আহার্য্য তৈয়ারী করিয়া রাখিবে? তাহার স্বামী মদ খাইয়া সব উড়াইয়া দিবে আর সে চুপড়ি কুলা চেটাই প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া হাটে বিক্রী করিয়া সেই পয়সা দিয়া স্বামীর অন্ন প্রস্তুত করিবে? সে বিবাহিতা পত্নী এই

মাত্র দাবী তাহার উপর গুলুয়ার আছে কিন্তু গুলুয়ার উপর তাহারও কি কোন দাবী নাই?

সন্ধ্যাবেলায় সে বড় কান্না কাঁদছিল। হায় নিষ্ঠুর গুলুয়া যে জানে না রোমলা তাহাকে কতখানি ভালবাসে, তাহার জন্য রোমলা কি না করিতে পারে? তাহার পায়ে কাঁটা ফুটিলে রোমলা নিজের বুকে সেই কাঁটার বেদনা অনুভব করে কিন্তু সে তো তাহা বুঝে না।

টলিতে টলিতে গুলুয়া অপরিসর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঘরে রেড়ির তৈলের প্রদীপটি টিপ টিপ করিয়া জ্বলিতেছিল, কিন্তু রোমলা ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া বসিয়াছিল। বাহিরে তখন স্ফুট চাঁদের আলোয় চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে।

"ভাত দে—"

রোমলা চোখ তুলিয়া একবার চাহিয়া তখনই চোখ থামাইল।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া গুলুয়া রাগিয়া উঠিল। একে প্রবল নেশা তাহার উপর প্রবল ক্ষুধা রাগ করিবারই কথা। সে চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল "ভাত দে হারামজাদী।"

রোমলার দুই চোখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, তীব্রকণ্ঠে সে

বলিল, ভাত কোথায় পাব মুখপোড়া, তুই কি চাল কিনে দিয়ে গিয়েছিলি যে ভাত রাঁধব ?"

"বটে হারামজাদী—"

সে বাঘের মত রোমলার উপর লাফাইয়া পড়িল এবং তাহার চুলের গোছা ধরিয়া টানিয়া উঠানে ফেলিয়া যতদূর পারিল প্রহার করিল, তাহার পরে শ্রান্ত ভাবে বারাণ্ডার ধারে বসিয়া পড়িল।

বৰ্দ্ধিতরোষা রোমলা বারাণ্ডার একধারে আঁচল বিছাইয়া শুইয়া রহিল। অভিমান আজ বড় বেশী রকম বেদনা দিতেছিল কারণ কখনও গুলুয়া তাহার গায়ে হাত তুলে নাই। চোখের জল মুছিতে মুছিতে সে ভাবিতে লাগিল এ অপমানিত প্রাণ সে আর রাখিবে না। হয় সে গলায় দড়ি দিবে, নয় জলে ডুবিবে অথবা কিছু আফিং কিনিয়া আনিয়া খাইয়া মরিবে। গুলুয়াকে সে দেখাইয়া যাইবে প্রহার করার ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ সে লইতে পারে।

ভোর বেলায় সে উঠিবার অনেক আগে গুলুয়া বাহির হইয়া গেল।

সেদিন রোমলা কোন কাজে হাত দিল না, গুম হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল কি উপায়ে গুলুয়াকে বিলক্ষণরূপে জব্দ করিতে পারা যায় যেন সে কাঁদে তাহাই করিতে হইবে।

লছমন আসিয়া সকৌতুকে অথচ গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল "কাল তোকে গুলুয়া মেরেছিল নাকি রে রোমলা ?"

বিস্মিত চোখ দুইটী তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া রোমলা বলিল "তুই কেমন করে জানলি ?"

লছমন বলিল, "ওই যে গুলুয়া বলে গেল। আরও শাসিয়ে গেল ফিরে এসে ভাত যদি না পায় তা হলে তোকে তিনখানা করে কেটে ফেলবে।"

রোমলার চোখে আগুন জ্বলিতে লাগিল ঠোঁটের উপর দাঁত চাপিয়া সে রুদ্ধ গর্জ্জনে বলিল, কখখনো ভাত রাঁধব না, কখখনো না। ওঃ বিহাতিয়া বউ পেয়েচে হুকুম খাটাবে। আমি কিছু করব না, না খেয়ে শুকিয়ে মরবে আমি তা দেখব।"

বুদ্ধিমান লছমন বুঝিল ইহাদের মধ্যে কি বিবাদ হইয়াছে; ব্যাপারটা বুছিবার উদ্দেশ্যে সে জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে রে রোমলা ?"

রোমলা দুই একটা ঢোক গিলিল; গলার কাছে কি একটা ঠেলিয়া উঠিতেছিল, কোনক্রমে সেটাকে নামাইয়া ফেলিল, রুদ্ধ গর্জ্জনে বলিল, "কি হয়েছে তা জানতে পারছিস নে ? লছমন, আমি আর এখানে থাকব না, আমায় হাবড়ায় গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসতে পারবি ?"

লছমন একটু ভাবিয়া বলিল, "পারব না কেন ? তুই কি দেশে যাবি ভাবছিস রোমলা ?"

একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া রোমলা বলিল, "হুঁ দেশে গিয়ে খেটে খাই গিয়ে, এখানে পড়ে, মার খাব কেন আমি তো পর কেনা বাঁদী নই যে পড়ে মার খাব।"

লছমন বললে, "ভাড়া লাগবে যে অনেক।"

রোমলা মলিন হাসিয়া গলা হইতে হাঁসুলীটা খুলিয়া দেখাইয়া বলিল, "এই হাঁসুলিটা বিক্রি করে দেনা লছমন তোকে এক টাকা জল খেতে দেব।"

সবেগে মাথা নাড়িয়া লছমন বলিল, "আমি কি ভিখারী যে তোর কাছ থেকে ভিক্ষা নেব? তুই এ কথা বলতে পারলি কি করে রোমলা?"

রোমলা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, একটুকু থামিয়া অনুনয়পূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "তুই রাগ করিস নে লছমন, কথাটা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে যাক, আমার এই উপকার তোকে করতেই হবে, কোন রকমে এটা বিক্রি করে আমায় হাবড়ায় তোকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসতে হবে।"

লছমন হাঁসুলিটা লইয়া চলিয়া গেল; খানিক পরেই সে বারটা টাকা আনিয়া রোমলার হাতে দিল।

রোমলা এই মুক্তিই চাহিতেছিল, কিন্তু মুক্তি পাইয়া তাহার মুখে প্রসন্নতা ফুটিল না, অন্ধকার যেমন জমাট বাধিয়াছিল তেমনই রহিয়া গেল।

বৈকালের ট্রেণে সে লছমনের সহিত উঠিয়া পড়িল। সকাল

হইতে এ পর্য্যন্ত গুলুয়া বাসায় ফিরে নাই। তাহারই প্রতীক্ষায় রোমলা বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত পথ চাহিয়াছিল, তাহার অন্তরে সকল আশা গিয়াও একটী আশা জাগিতেছিল যদি সে আসে, যদি সে তাহার হাত দুখানা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলে—সে আর এমন কাজ করিবে না। তাহার পরে সে আবার রোমলাকে প্রহারই করুক আর যাহাই করুক, এখন শুধু এই কথাটীর উপরেই নির্ভর করিয়া রোমলা থাকিতে পারিত, কখনই সে যাইত না।

শেষ পর্য্যন্ত সে দেখিল, গুলুয়া আসিল না। লছমন কাপড় জামা পরিয়া প্রস্তুত হইয়া সংবাদ দিল গুলুয়া অতিরিক্ত রকম মদ খাইয়া ইবনির ঘরের বারাণ্ডায় মাদল বাজাইয়া গান গাহিতেছে।

মন হইতে গুলুয়ার ভাবনা বিসর্জ্জন দিয়া রোমলা উঠিয়া পড়িল, অকম্পিত পদে ট্রেণে উঠিয়া বসিল।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

জানালা পথে বাহিরের পানে তাকাইতে রোমলার মনে পড়িল ঘরের কথা, সে ঘর আজ সে চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া চলিল।

মনে পড়িল গুলুয়াকে দেখিতে আর কেহ রহিল না। ইবনি তাহার সুখের অংশ লইতে পারিবে, দুঃখের অংশ লইবে না।

গুলুয়া সন্ধ্যার পর নিশ্চয়ই বাড়ী ফিরিবে, রাত্রে সে কোথাও থাকে না, থাকিতে পারিবে না, ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আজও সে আসিবে, তখন সে কি দেখিবে? দেখিবে রোমলা চলিয়া গিয়াছে, তখন সে কি মাথায় হাত দিয়া বসিবে না?

সে যে মারিয়াছে সে কথাও হয় তো তাহার মনে নাই। সামান্য প্রহারে রোমলাকে কতটুকুই বা দৈহিক বেদনা দিয়াছিল, সে বেদনা তখনই তো সারিয়া গেছে। সেই কথাটা মনে অনবরত দোলা দিয়া জাগাইয়া রাখিয়া তাহারই প্রতিশোধ লইতে কেন সে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে পা বাড়াইল? কই, যেখানে সে প্রহার করিয়াছে সেখানে একটু চিহ্নও যে নাই, বেদনাও তো নাই।

মনে পড়িল—গুলুয়া তাহার দুদিনের সঙ্গী নয়, সে তাহার জন্মজন্মান্তরের সঙ্গী! আজ সেই সঙ্গীকে একা ছাড়িয়া দিয়া সে চলিয়া যাইতেছে কোথায়? সে দেশে যাইতেছে, কিন্তু সেখানে গিয়া সে থাকিবে কি করিয়া?

রোমলা ছটফট করিতে লাগিল, গোপনে কতবার সে অশ্রুজল মুছিল তাহা লছমন দেখিতে পায় নাই। সে অন্য মনে বাহিরের পানে চাহিয়াছিল ও কি করিয়া রোমলার দেশে যাওয়া স্থগিত করিয়া নিজের পাশে তাহাকে টানিয়া লইতে পারে তাহাই ভাবিতেছিল।

সে যখন মুখ ফিরাইল রোমলা তখন স্থির হইয়াছে।

তাহার মলিন অথচ গম্ভীর মুখখানার পানে তাকাইয়া লছমন বলিল, "দেশে গিয়ে কি করবি রোমলা, দেশে কি কাজ আছে যা তুই করবি? দেশে তোর কেউ নেই, কে তোকে দেখা শোনা করবে? তার চেয়ে আমি বলি—দেশে গিয়ে দরকার নেই, এই দেশেই একটা কাজ নিয়ে থাক। তুই তো জানিস আমি সাহেবের কাজ করি, তোর একটা কাজ আমি ওখানেই করে দেব।"

রোমলা মুখ তুলিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "ওদেশে আমি আর থাকব না লছমন; গুলুয়ার কাছাকাছি—"

কথাটা শেষ করিতে না পারিয়া সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

উৎসাহিত হইয়া লছমন বলিল, "তা না হয় তুই ওখানে নাই থাকলি, আমার কাছে থাকবি। দেখ রোমলা, আমি তোকে সঙ্গো করব ঠিক করেছি, তা হলে গুলুয়ার ভয় করতে হবে না। সাহেবকে বলেছি, তিনি বললেন এ রকম সঙ্গো হয়। আমি গুলুয়া নই, আমি লছমন, আমার কথার ঠিক আছে কিনা দেখে নিস।"

রোমলা নীরবে শুধু চাহিয়া রহিল।

কাতর হইয়া লছমন বলিল, "তুই রাজি হ রোমলা, আমি তোকে কত ভালবাসি তা দেখতে পাবি।"

রোমলা শক্ত হইয়া বসিয়াছিল ; নিকটে আসিয়া লছমন তাহার অনাবিল ভালবাসার একটা গান গাহিয়া চলিল। জানাইল, রোমলাকে সে খুব সুখে রাখিবে !

আসানসোলে যখন ট্রেনখানা গিয়া পৌঁছছিল তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে।

শ্রান্তকণ্ঠে রোমলা বলিল, আজ রাতে এই ষ্টেশনেই থাকব লছমন, কাল সকালে যা হয় করা যাবে। আমি এইখানে শুয়ে পড়ি, শরীরটা ভাল লাগছে না।"

ষ্টেশনের একপাশে সে একখানা কাপড় বিছাইয়া তাহার উপর শুইয়া পড়িল।

ব্যস্ত হইয়া লছমন বলিল, "এখানে শুয়ে পড়লি কেন রোমলা, যদি কেঁউ কিছু বলে ?"

রোমলা বলিল, "বলে আমি বুঝে নেব। তুই যদি কোথাও যেতে চাস তবে যা, আমায় একা থাকতে দে।"

লছমনেরই বা যাওয়ার স্থান কোথায় ? সে রোমলার পার্শ্বে বসিয়া প্রকৃত প্রণয়ীর মতই বলিল, "তো[illegible] এখানে একলা ফেলে চলে যাব তুই আমায় এমনই নীচ ভাবলি রোমলা ? গুলিয়া যদি হত—যেতে পারত, কিন্তু আমি যেতে পারব না।

দীপ্ত হইয়া উঠিয়া রোমলা বলিল, বারবার তার নাম করছিস কেন বলতো ? আমি তোর কি করিছি যার জন্যে আমার কাটা

ঘায়ে নুন লঙ্কা দিচ্ছিস ? বলছি তুই যা ক্ষণিক আমার কাছ হতে, তোর সঙ্গ আমার আর ভাল লাগছে না।”

অবাক হইয়া লছমন রোমলার দীপ্ত মুখখানার পানে তাকাইয়া রহিল। রোমলা তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া কেন যে এমন দূর করিয়া দিতে চাহিতেছে, কেন যে তাহার সঙ্গ হঠাৎ রোমলার নিকট অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিতে গেল আজ তো কিছু খাসনি রোমলা, কিছু খাবার—

চেঁচাইয়া উঠিয়া রোমলা বলিল, “ফের বিরক্ত করছিস লছমন, বলছি আমি কিছু খাব না, আমার ক্ষিধে হয়নি। তুই একটু তফাতে যা দেখি।”

বাড়াবাড়ি দেখিয়া বেচারা লছমন মলিন মুখে সরিয়া বসিল। স্ত্রীচরিত্র বুঝিবার শক্তি তাহার ছিল না, সে আশ্চর্য্য হইয়া শুধু ভাবিতেছিল—এ কি হইল ? গুলুয়াকে ত্যাগ করিয়া আসিয়া আবার গুলুয়ার কথা মুখে আনিতে রোমলা কাঁদে কেন ?

ভাবিতে ভাবিতে চারিদিক্‌কার গণ্ডগোলের মধ্যে কখন তাহার চোখ দুটি বুজিয়া আসিল।

কতক্ষণ পরে একটা ধাক্কায় তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, রোমলা ডাকিতেছে আমি এই ট্রেনে যাচ্ছি লছমন, তোকে জানিয়ে গেলুম।”

বিস্মিত নেত্রে লছমন দেখিল, রোমলা মেলে উঠিয়া পড়িল।

লছমন ধড়কড় করিয়া উঠিতে যাইবার প্রারম্ভে রেলপুলিশের হাতে ধরা পড়িল, ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

ট্রেনখানা হাবড়ার ষ্টেশনে গিয়া যখন পৌঁছাইল তখন রাত্রি অনেক বাজিয়া গিয়াছে। ষ্টেশনে ট্রেন থামিতেই রোমলা নামিয়া পড়িল। টিকিট দিয়া সে বাহিরে অন্ধকারের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

অদূরে সর্দ্দারের ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছে, দুই একখানা কুটীরে আলো জ্বলিতেছে, কেবল তাহার ঘরই অন্ধকার।

কম্পিত পদে অগ্রসর হইতে গিয়া রোমলা কতবার থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর অগ্রসর হইল।

কৃষ্ণা দশমীর চাঁদখানা এমনি সময়ে পূর্ব্বাকাশ উজ্জ্বল করিয়া জাগিবার উদ্যোগ করিতেছিল, তাহার মৃদু আলো পৃথিবীর বুকের জমাট বাঁধা অন্ধকাররাশীকে অল্পে অল্পে জাগাইয়া দিতেছিল। তাহাতে পথ চিনিয়া রোমলা চলিল।

সামনে তাহার ঘর। চাঁদ তখন আকাশে উঠিতেছে, আলো ঘরের মটকার উপর আসিল, ক্রমে নীচে নামিতে লাগিল।

কে জানে গুলুয়া আসিয়াছে কি না। হয়ত সে ইবনির নিকটে পড়িয়া আছে। আজ সে বেতন পাইয়াছে, অন্যবারে দু'চার টাকা আনিয়া রোমলার হাতে দেয়, আজ একদিনেই সে যে সব টাকা উড়াইয়া দিয়াছে তাহাতে রোমলার সন্দেহ ছিল না।

সন্তর্পণে সে উঠানে নামিল ; অগ্রসর হইতে গিয়া বারাণ্ডার দিকে তাকাইয়া সে চমকাইয়া উঠিল।

অল্প পরিসর বারাণ্ডায় কে পড়িয়া রহিয়াছে, গুলুয়া না ?

•

রোমলা ক্ষণিক আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কি করিবে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল তেমনই নিঃশব্দে আবার ফিরিতেছিল। আসার সময় যতটা সন্তর্পণে সে আসিয়াছিল যাওয়ার সময় তত সন্তর্পণে সে ফিরিতে পারিল না ; উঠানের মাঝখানে ভাঙ্গা টিনটা বহুদিন হইতে পড়িয়াছিল তাহাতে পা লাগায় সেটা ঝন ঝন্ করিয়া উঠিল।

"রোমলা—"

গুলুয়া এক লাফে উঠিয়া ছুটিয়া আসিল, বিনা দ্বিধায় তাহাকে দুইটী বলিষ্ঠ বাহু দ্বারা জড়াইয়া বুকের মধ্যে টানিয়া

লইল, তাহার দুই চোখের জলে রোমলার মাথা মুখ ভাসিয়া গেল।

যেন কতকাল রোমলা তাহাকে ছাড়িয়া দূরে—বহু দূরে চলিয়া গিয়াছিল, এইমাত্র সে ফিরিয়াছে। অপরাধিনী রোমলা দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

গুলুয়া চোখ মুছিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমায় মাপ কর রোমলা, আমি আর কখনও তোকে কিছু বলব না, তুই আমায় ফেলে কোথাও চলে যাস নে। রাক্ষসী ইবনি আমার সর্ব্বনাশ করেছিল, তোকে পর্য্যন্ত আমার মন হতে তাড়াতে চেয়েছিল। আমায় মাপ কর রোমলা, আমি কাল হতে খুব ভাল হব দেখে নিস। তোকে নিয়ে এ জায়গা ছেড়ে অন্যস্তরে চলে যাব, আর যদি মদ খাই,—এই তোর গা ছুঁয়ে দিব্যি করচি। এবারকার মতন আমায় মাপ কর রোমলা, বল মাপ করেছিস, কিছু দোষ নিস নি?"

রোমলা কান্নাভরা সুরে বলিল, "তোকে মা[illegible] না করে আমার কি থাকবার যো আছে গুলুয়া? তোকে ফেলে আমি কোথাও গিয়ে থাকতে পারব না। সমস্ত দিনটা তোর পথ চেয়েছিলুম, যদি আসিস—একবার রোমলা বলে ডাক দিস—আমি সব ভুলে যাব। কিন্তু তুই তো আসিস্ নি গুলুয়া, রোখের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। গাড়ীতে উঠতে না উঠতে

খালি কান্না পেতে লাগল কে তোকে দেখবে খাওয়াবে তাই ভেবে। দশটার মেল আসছে দেখে উঠে পড়লুম। আজ কিছু খেয়েছিস গুলুয়া ?

গুলুয়া মাথা নাড়িল,—"কিছু খাই নি, মদও খাইনি। সকাল হতে কাজ করেছি। রাগ করে বাড়ী এলুম না; ভাবলুম তুই ভাত রেঁধে ডাকতে যাবি, তুই গেলি নে দেখে রাগ আরও বাড়তে লাগল। বিকেলে বাড়ীতে এসে দেখলুম নেই, তুই রাগ করে চলে গেছিস। অত যে ক্ষিধে আমার—সব কোথায় গেল, সেই থেকে এই দাওয়ায় শুয়ে পড়ে খালি কাঁদছি রোমলা, আগে তো জানতে পারি নি—তোকে এতটা ভালবাসি, তুই না থাকলে আমার সব খালি হয়ে যায়।

চাঁদের আলো তখন মুক্তভাবে সমস্ত পৃথিবার বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

গুলুয়ার আলিঙ্গনপাশ হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া রোমলা ব্যস্তভাবে বলিল, "সারাদিন জল ইস্তক খাস নি, চল—ভাত রেঁধে দিই গিয়ে।"

গুলুয়া শ্রান্তভাবে বলিল, "থাক, আর এই রাতটুকু বই তো নয়।"

"তা বললে কি চলে ? আজ সারাদিন রাত উপোস করে থেকে আবার কাল ভোর হতে থাকবি কি করে ? তুই দাওয়ায় শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নে, আমি চট করে ভাত রেঁধে আনি।"

রোমলা ঘরে প্রবেশ করিয়া আলো জ্বালিল। তাড়াতাড়ি দাওয়ার পাশের উনানটী ধরাইয়া তাহাতে হাঁড়ি বসাইয়া দিল।

পরদিন লছমন আসিয়া বিস্মিত চোখে দেখিল কিছুদিন পূর্ব্বে স্বামী স্ত্রীর দিন যেমন নির্ব্বিবাদে মহানন্দেই কাটিত, তেমনি কাটিতেছে ; ইহাদের মাঝখানে ইবনি উঠিয়া যে মহা বিপ্লব ঘটাইয়াছিল, যাহার জন্য উভয়েই উভয়ের নিকট অপরাধী, সে জন্য উভয়েই অনুতপ্তভাবে উভয়ের হস্তে সব ভার ছাড়িয়া দিয়াছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া লছমন দূরে সরিয়া গেল।

সমাজ-দ্রোহী

জীবনের পথ বেয়ে চলবার কালে একদিন হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল।

আজ সেদিন সুদূর অতীতে মিশে গেছে, কিন্তু সেই পথে-চলার দাগটা যে মনের মধ্যে এঁকে গেছে তা আর মিশায় নি, বোধ হয় কখনো মিশিবেও না।

সেদিনের কথাটা আজও খুব উজ্জ্বল হয়ে মনে জেগে আছে, যদিও তার পর আরও অনেক দিনই দেখা হয়েছিল কিন্তু সেদিনকার মত মনে দাগ এঁকে দিয়ে চিরকাল জাগিয়ে রাখতে আর কোন দিনই সমর্থ হয় নি।

সেদিন সে মেয়েটি ছিল তরুণী, বোধ হয় বছর তের চৌদ্দ তার বয়স হবে। সাজিটি তার ফুলে ভরে নিয়ে সে চলেছিল পথ দিয়ে, আমি বিপরীত দিক দিয়ে আসছিলুম। আমায় দেখে সে একটুও সঙ্কুচিত হয় নি, বেশ সঙ্কোচহীন ভাবে সে একটু পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল, সঙ্কোচহীন চোখে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

তরুণীর চোখের সঙ্গে আমার চোখ মিলে যেতে লজ্জায় আমারই মাথাটা যেন নুইয়ে পড়ল। আমি থমকে দাঁড়ালুম, পথটা বড় সঙ্কীর্ণ ছিল, যদিও সে পথ ছেড়ে একটু পাশে দাঁড়িয়েছিল তবুও পথের পানে তাকিয়ে আমার মনে হল, এ পথ বেয়ে চলতে গেলে তার স্পর্শ আমায় অনুভব করতে হবেই। তার সাজির পানে নজর পড়ল, মনে হল—ফুল এমনি হাতেই মানায় বটে, মনে হল—এ ফুল দিয়ে কি হবে, মালা গাঁথা—না দেবপূজা ?

এক মুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়িয়ে থেকে আমি ফিরছিলুম, সে একটু হেসে বললে, ফিয়ে যাচ্ছেন কেন, এখান দিয়ে যেতে পারবেন না ?

আশ্চর্য্য হয়ে আবার ফিরতেই তার সেই আশ্চর্য্য চোখ দুইটির পানে আমার দৃষ্টি পড়ল, ভাবলুম মেয়েটি লজ্জা কাকে বলে তা আজও শেখে নি, তার নিটোল গাল দুটি লাল হয়ে উঠেছিল,—সে কি লজ্জায় ?

পুরুষত্বের অহঙ্কারটা মনে জেগে উঠল, তাই তো, ফিরে যাব কেন একটি ছোট্ট মেয়েকে দেখে ? সে তো পাশ দিয়েছে, চলে যেতে আমার বাধাটা কি ?

এগিয়ে পড়লুম। তার পাশ দিয়ে যেতে একটি সুন্দর গন্ধ আমার কাছে ভেসে এল, আমার মনটা যেন অকস্মাৎ ভরে উঠল ; কাছ দিয়ে যেতে আমি আবার তার পানে চেয়ে দেখলুম, সে

প্রাণপণে তার দৃষ্টিকে সংযত করে অন্যদিকে ফিরিয়ে রেখেছে।

একটু তফাতে এসে দেখলুম মেয়েটি পথের মাঝে দাঁড়িয়ে; দৃষ্টি তার কোন অনির্দ্দিষ্ট পথে বদ্ধ করে এক পা দু-পা করে চলেছে।

দুই

আর দুই একবার দেখা হতেই পরিচয়টা বেশ গাঢ় হয়ে উঠল।

বড় অস্থির দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির মেয়ে ছিল সে, এতেই সে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সে তার বাইরের খেয়ালটাকে নিয়েই মশগুল থাকত, অন্তর-রাজ্যে যে বিপ্লবের সুরু হয়েছে সে খবর তখনও তার কাছে গিয়ে পৌঁছায় নি, সে তখনও কোমরে কাপড় জড়িয়ে অত্যন্ত সাধারণ ভাবেই পথে দৌড়ায়, গাছে ঢিল ছোঁড়ে, পুকুরে সাঁতার কেটে জল তোলপাড় করে।

চিরকাল তার বাপ থাকতেন বিদেশে, স্ত্রী-কন্যাও তাঁর কাছে ছিল। তিনি মারা যেতে তারা আজ মাস দুই তিন

দেশে এসেছে মাত্র, এরই মধ্যে মেয়েটি তার অসাধারণ কাজের জন্যে সকলের কাছেই পরিচিত হয়ে গেছে। আমি গ্রীষ্মের বন্ধের পরে এ কয় মাস কলেজ ছেড়ে ছিলুম, তাকে এই প্রথম দেখতে পেলুম।

সত্য কথা বলব—তার এই দুষ্টুমীটুকু আমার বেশ ভাল লাগত। প্রথম সে আমার সঙ্গে বেশ ভদ্র ভাবেই চলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মানুষের প্রকৃতি নাকি বাহ্য আড়ম্বরে ঢাকা দেওয়া যায় না, কখনো না কখনো তা প্রকাশ হয়ে পড়বেই,—শুধু এই জন্যই তার স্বভাব চাপা দেওয়া থাকল না, তার দুষ্টুমী ক্রমেই প্রকাশ হয়ে পড়তে লাগল।

বাইরের থেকে এবার সে ভিতরে আমার পড়ার ঘরে পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভ করল। আমি পড়তুম, কারণ পরীক্ষা সামনে এসেছে, এখন আর পড়ার ঔদাস্য সাজে না, অবশ্য যদিও আগে—কিছু কষ্ট হয় বলে পড়ায় হেলা করেই এসেছি। রেণু প্রথমটা আশ্চর্য্য হয়েই দেখত, অনেকবার জিজ্ঞাসাও করেছে আমি এত বড়—আমার আবার পড়তে হয় কেন। প্রথম বেশ ভাল ভাবেই উত্তর দিয়েছি, শেষকালে আর তার অনাবশ্যক প্রশ্নের উত্তর দিতুম না।

বেশীক্ষণ শান্ত হয়ে থাকা তার প্রকৃতিতে পোষাত না, ক্রমে সে আমার পড়ার টেবিলেও উপদ্রব আরম্ভ করে দিল।

মা বিরক্ত হয়ে বলতেন, মেয়েটাকে অতটা আদর দিয়ে

কেন মাথায় তুলছিস মহিম, অমন দুষ্টু মেয়ে দুনিয়ায় যদি আর একটা দেখা যায়।

আমি একটু হাসতুম, কিন্তু সহস্র উপদ্রব করা সত্ত্বেও তাকে কড়াকথা বলে তাড়াতে পারতুম না। সকাল বেলা হতেই সে সকালের আলোর মতই এক ঝলক হাসি ছড়িয়েছুটে আসত, আমাকে তখন তার মুখের পানে একটু খানির জন্যেও তাকাতে হতো।

ছুটি ফুরিয়ে গেলে আমি যখন কলকাতায় যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিলুম সেদিনও সে তেমনি হাসি মুখে আমার ঘরে এসে ঢুকেছিল। আমি বইগুলো গুছোচ্ছি দেখে সে অবাক হয়ে গিয়ে বললে, বই গুছোচ্ছ কেন মহিম-দা ?

আমি বললুম, আজ যে কলকাতায় যাচ্ছি।

এক মুহূর্ত্তে সে যেন নিভে এল ; মুখখানা তার বিবর্ণ হয়ে গেল, একটু থেমে একটা ঢোঁক গিলে সে জিজ্ঞাসা করলে, কলকাতায় গিয়ে কি করবে ?

আমি বললুম, পড়ব, পাশ করতে হবে যে।

সে অবুঝের মত বললে, পাশ করে কি হবে ?

আমি বললুম, মানুষ হব।

অবাক হয়ে গিয়ে সে বললে, পাশ না করলে বুঝি মানুষ হয় না ?

তাকে বুঝাতে গেলে অনেক কথা বলার দরকার, তাই আমি খুব সংক্ষেপে বললুম, না।

সে খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল, তারপর কখন যে নিঃশব্দে উঠে চলে গিয়েছিল তা আমি জানতে পারি নি, পিছন ফিরে আমি তাকে আর দেখতে পেলুম না। বাইরে মা'র তর্জ্জন গর্জ্জন শুনতে পেলুম, তিনি কাকে বকছেন—পোড়ারমুখী, চোখে যেন দেখে-শুনে হাঁটতে পারে না, দস্যি মেয়ে বাবা, এ মেয়ে যার ঘরের বউ হবে সে ঘরে কখনো লক্ষ্মী হবে না। মাগো মা, বোতলগুলো সব পা দিয়ে ফেলে ভাঙলে, তেল পড়ে ভেসে গেল। দূর হ আপদ, আবার যদি এ বাড়ী-মুখো হবি তো ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়ব।

বেশ বুঝতে পারলুম ব্যাপারখানা কি, তাই আর উঠলুম না, দেখলুমও না।

সেই দিনই আমি কলকাতায় চলে গেলুম।

তিন

কয়টা দিন একজামিনের ভাবনায় এত ব্যস্ত ছিলুম যে, মেয়েটির কথা মোটেই মনে হয় নি। একজামিন মিটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কথা আমার মনে অতর্কিতে কখন জেগে উঠল।

সেবার যখন বাড়ী গেলুম তখন চঞ্চল সে মেয়েটিকে আর আসতে দেখলুম না। শুনলুম তার নাকি বিয়ের কথা হচ্ছে। মা উপসংহারে এই বললেন, বাবাঃ, যে মেয়ে, গাঁ সুদ্ধ সবাই জানে ও-মেয়ে যার ঘরে যাবে তার ঘরে লক্ষ্মী থাকবে না, তাই যে কেউ মেয়ে দেখতে আসছে সেই জবাব দিয়ে যাচ্ছে। ও-মেয়ের বিয়ে হওয়াই ভার—এ সত্যি কথা।

তার বিয়ের কথা শুনে সত্যি বুকের মধ্যে কি রকম একটা ছোটখাট আঘাত পেলুম।

সে দিন বিকালে বেড়াতে যাচ্ছিলুম, পথেই তার মায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তিনি অনেক করে বলে আমায় তাঁদের বাড়ী টেনে নিয়ে গেলেন। সত্য কথায় বলতে দোষ নেই,

আমারও একবার সে চঞ্চল মেয়েটিকে দেখবার ইচ্ছা ছিল, নইলে কখনই যে যেতুম না তা সেও জানত না।

মায়ের আদেশমত রেণু একখানা আসন পেতে দিয়ে গেল, দেখলুম তার মুখখানা বড় কঠিন হয়ে গেছে, সে ভাল করে আমার দিকে চাইলে না, আমার সঙ্গে একটা কথাও বললে না।

তার মা অনেক কথা বললেন, রেণুর বিয়ের সম্বন্ধ অনেক জায়গা হতে আসছে, অনেকে পছন্দও করেছে কিন্তু গাঁয়ের লোকের কথা শুনে শেষকালে সবাই জবাব দিচ্ছে। মেয়েরও এদিকে প্রায় পনের বছর বয়েস হতে চলেছে, বিধবা আত্মীয়-স্বজনবিহীন তিনি, এ অবস্থায় কি করবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না, তাই আমার কাছে পরামর্শ চান; কেননা আমি তাঁর শিক্ষিত আত্মীয়; যদিও আত্মীয়তাটা গ্রাম সম্পর্কীয়ই।

আমি বেশ লম্বা চওড়া এক লেকচার দিলুম,—[illegible]শ তো, বিয়ে না হয় ক্ষতি কি? সবারই যে বিয়ে কর[illegible] হবে এমন তো কোনও কথা নেই। আজকাল দেশের যে রকম অবস্থা তাতে কতকগুলি কুমার কুমারীর দরকার,—যাদের কোনদিকে আকর্ষণ থাকবে না, তারা প্রাণ ঢেলে দেশের কাজ করবে। রেণুর যদি বিয়ে না হয়—থাক, তার দ্বারা অনেক কাজ হবে।

বিধবা আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে বললেন, তাও কি হয় বাবা; আমাদের দেশের সমাজ সব অনাচার সইতে পারে, মেয়েকে কুমারী রাখার প্রস্তাব কখনো সইতে পারবে না; তা হলে আমায় 'একঘরে' করবে।

তরুণ বুকের রক্ত তখন বড় গরম, উত্তেজিত হয়ে বললুম, হলেনই বা সমাজচ্যুত তাতে কি?

তাতে কি? বিধবা একটু হাসলেন মাত্র। পরে বললেন, বাবা, এ দেশের পুরুষদের যখন সে সাহস নেই, দরিদ্র আত্মীয়হীন বিধবা হয়ে আমি সে সাহস করি কি করে, ভাব দেখি? মেয়ে আমার দুষ্টু, এই মাত্র তার অপরাধ, এর জন্যে যে দেশের লোক তাকে ঘরে নিতে চায় না, মেয়েকে কুমারী রাখলে কি তারা চুপ করে থাকবে? বাবা, আমি তোমায় ডেকেছি, জানি তুমি ওকে ভালবাস, সকলের মত ওকে ঘৃণায় চোখে দেখ না, তুমি যদি দয়া করে ওকে গ্রহণ কর—

আমি হঠাৎ এতটা চমকে উঠলুম যাতে বিধবাও সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন, জড়িতস্বরে কি যে তিনি বললেন, তা বুঝতে পারলুম না।

মনটা ঠিক বুঝি এই-ই চাচ্ছিল, কিন্তু কি করে তা হবে, হওয়ার উপায় নেই যে। তাঁরা দক্ষিণ রাঢ়ি কায়স্থ, আমরা উত্তর রাঢ়ি, জানি এই হ'চ্ছে প্রধান কারণ, তারপর—সে যে

খ্যাতি অর্জ্জন করেছে তাতে প্রস্তাব করলেই মা তাড়া করে আসবেন।

আমি মাথা নাড়লুম, জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বললুম, তাও কি হয় কাকি-মা?

তিনি তবু জোর করে বললেন, কেন হবে না বাবা? এই সমাজের ওজর করবে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি—এই সমাজের কাছ থেকে তোমরা কতটুকু পেয়েছ আর কতখানি পাবে! যে সমাজ অধীনতায় পূর্ণ হয়ে গেছে সে সমাজের সংস্কার আবশ্যক কিনা তা বিবেচনা করবে তোমরা—কেন না তোমরা শিক্ষা পেয়েছ। বাবা,—মানুষের জন্যে সমাজ সৃষ্টি হয়েছে—না সমাজের জন্যে মানুষ সৃষ্ট হয়েছে, তাই আমি জিজ্ঞাসা করছি। আমি জানি, তুমি রেণুকে ভালবাস, কিন্তু তাকে গ্রহণ করতে পারবে না সে শুধু সমাজের জন্যে, তোমার সমাজ তোমার নির্ব্বাসন দেবে বলে তাই। মানুষের মন তা হলে কিছুই নয়, তাকেও এই ঈর্ষাপ্রসূত সমাজের আইনে দলিত পেষিত হতে হবে? আমি বলি,—সমাজের চেয়ে মানুষ বড়, মানুষের ইচ্ছা বড়। ব্যর্থতা বুকে ধরে সমাজের কোলে বাস করে চিরকাল হাহাকার করার চেয়ে সফলতাকে বরণ করে এমন সমাজের বুকে নতুন ভাবের প্রেরণা জাগিয়ে তোলা শিক্ষিতেরই কাজ। আমি তোমার কাকি-মা, গুরুজন হয়েও অনেক কথা তোমায় বলছি, কিন্তু এগুলো দুষনীয় নয়, আমি

তোমার শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে চাচ্ছি। ভালবাসা জিনিষটা হেয় নয় মহিম, প্রকৃত প্রেমিক একেই স্বর্গ বলে উল্লেখ করতে পারেন। এই ভালবাসার জন্যে প্রকৃত প্রেমিক আর সবই ত্যাগ করতে পারেন, সেটা দোষাবহ নয়, সেইটাই প্রকৃত। এই সমাজের শাসনে এমন ঢের নর-নারী আছে যারা মিলতে পারে নি, তাদের জীবনটাই তারা ব্যর্থ মনে করে। অথচ তারা যে নিজের নির্দ্দিষ্ট কাজ না করে যাচ্ছে তা নয়, কিন্তু তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন নেই। মহিম, এমনি ব্যর্থতা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে—এমন ভাবে সমাজের পায়ে সব বিসর্জ্জন দিয়ে বাঁচার চেয়ে একেবারে মরে যাওয়া ভাল, না এমন সমাজকে চূর্ণ করে দেওয়া ভাল? হতাশ হয়ে মরে সবাই, মরেছেও অনেকে, তাতে সমাজের তো কিছু হয় নি। তাই বলছি, মরেও মরার সার্থকতা নেই যখন, তখন বেঁচে থেকে যাতে এমন নিরাশ আর কেউ না হতে পারে তারই চেষ্টা কর, নতুন সমাজ সৃষ্টি কর।

* * *

কথাগুলো যথার্থ সত্য, সামান্য একটি নারীর মুখে এমন সতেজ কথা শুনবার আশা আমি কখনই করি নি, বিস্ময়ে আমি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। কথাগুলো ঠিক আমার অন্তরে গিয়ে আঘাত করেছিল, কিন্তু কোন কোনও লোকের দুর্ব্বলতা যেমন বেশী থাকে আমারও তেমনি ছিল বলেই আমি মৃদুকণ্ঠে

বললুম, আপনি মা'র কাছে কথাটা বলবেন কাকি-মা, আমার কাছে—

তীব্র একটু হাসির আভাস রেণুর মায়ের মুখে ভেসে উঠল, তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, ভাল কথা, কিন্তু এটা তো ঠিকই জানা কথা, তোমার মা কখনই আমার মেয়েকে গ্রহণ করতে পারবেন না। নিজেকে এই সমাজেরই পায়ের কাছে বলিদান দিচ্ছো—দাও, কিন্তু বাবা, হয় তো একদিন তোমায় এরই জন্যে অনুশোচনা করতে হবে।

উঠে পড়লুম, এর পর আর সেখানে থাকবার শক্তি যেন ছিল না।

কথাটা ভাবিবার মত; কিন্তু কাজে পরিণত করতে যে সাহস দরকার সে সাহসটুকু আমার কই ?

চার

একটা কাজের ওজর করে পরদিনই আমি কলকাতায় পালালুম। আমাদের একটা ক্লাব ছিল, ইচ্ছা ছিল ক্লাবে এই কথাটা বলে আমার নব্যতন্ত্রের বন্ধুদের মতটা নেব, তারপর এগিয়ে যাওয়া অথবা পেছিয়ে পড়া আমার ইচ্ছাধীন।

আমার যাওয়ার কয়দিন পরেই মা'র পত্র পেলুম—রেণুর বিয়ে হয়ে গেল, কলকাতাতেই তার স্বামীর বাড়ী, সেখানে তাকে নিয়ে গেছে। আশ্চর্য্য কথা, রেণুর বিয়ের আগের দিন রেণুর মা রেণুর সঙ্গে আমার বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে মা'র কাছে গিয়েছিলেন, অনেক নতুন কথাও শুনিয়েছেন, মা তাঁর স্পর্দ্ধা দেখে খুব রাগ করে যা তা বলে বিদায় দিয়েছেন।

আমার মনে রেণুর মায়ের কথাগুলো জেগে উঠল, রেণুর কথা মনে হল, বেদনাদীর্ণ বুক চেপে চুপ করেই রইলুম।

সে দিন আমাদের ক্লাবের অতুল মিত্র অনেকদিন বাদে ফিরে এসেছে। শুনলুম সে বিয়ে করে এসেছে, তার স্ত্রী

স্বজাতির মেয়ে নয় বলে দেশের সকলের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে সে চলে এসেছে।

আমার বুকটা আচমকা চমকে উঠল। অতুল চেয়েছে প্রেমের দিকে, সে তার যথা সর্ব্বস্ব হারিয়েও যে তার প্রিয়তমাকে কাছে পেয়েছে এই পাওয়ার নেশায় ভরপূর, অন্য কষ্ট তাকে এতটুকু ব্যথা দিতে পারে নি, কিন্তু আমি ?—

কতবার দেশে গেলুম, রেণুকে আর দেখতে পাই নি। তার মা মারা গেছেন, দেশের সঙ্গে তার সকল সম্পর্কই মিটে গেছে।

মা আমার বিয়ে দেওয়ার জন্যে অনেক চেষ্টা করছিলেন কিন্তু বিয়ে করার প্রবৃত্তি আমার আর ছিল না। মানুষের জীবনে বিয়ে একবারই হয়ে থাকে, জন্ম মৃত্যু যেমন দুবার হয় না, বিয়েও তেমনি দুবার হয় না বলে আমার মনে ধারণা জন্মেছিল। হাতে পেয়ে তাকে ঠেলে দিয়েছি ; এই পেয়ে-হারানোর ব্যথাটা আমার বুকে দিনরাত কাঁটা বিঁধাত। আমি কিছুতেই বিয়েতে মত দিতে পারলুম না।

মা চোখের জলে ভেসে জানতে চাইলেন, কেন আমি বিয়ে

করতে চাচ্ছি নে। উত্তরে হেসে বললুম, এমনি, নিজের ইচ্ছামত মা, বিয়ে করতে যথার্থ ই আমার ইচ্ছে নেই।

তারপর বহুকাল কেটে গেছে; আমি এখন বৃদ্ধ, আমার দেহের যৌবন গেছে কিন্তু অন্তরের তরুণ ঘুমায় নি, আমার অন্তরে আজও রেণু জেগে আছে। আমি অসার জীবনের এতকালের মধ্যে আর তার খবর পাই নি। তার নাম হয় তো সবাই ভুলে গেছে, কিন্তু আমার মনে সে এখনও জেগে, এখনও সে সেই তরুণী মূর্ত্তিতে পথের ধারটিতে ফুলের সাজিটি হাতে নিয়ে যেন আমারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে!

আমার মাথার কাল চুল সব সাদা হয়ে গেছে, চলতে পা কাঁপে—কিন্তু এমনি আশ্চর্য্য যে রেণুর ঐ প্রতীক্ষারত মূর্ত্তি আমি ভুলতে পারিনে। শুধুই মনে হয় আর কেউ তার ওপর যতই অবিচার করুক না কেন, সব চেয়ে বড় অবিচার করেছি আমি। তাই আজ আমি নীরবে বয়ে চলেছি তার স্মৃতিটুকু বহন করে। জানিনা কোথায় কতদিনে হবে এর পরিসমাপ্তি।

সেই রেণু, ভাল যে বাসত আমাকে, আমিও যে কত ভালবাসতাম তাকে তা আজ আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছি। কিন্তু হায়! উভয়ের মধ্যে আজ দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। তবুও মন তারই স্মৃতি নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে চায় এই ধরণীর বুকে। মন চায় একবার তার সঙ্গে শেষ দেখা করতে। কিন্তু কোথায় কতদূরে সে কে জানে?

এমনি সময়ে একদিন নিমেষের জন্যে দেখা পেয়েছিলুম, সে-ই শেষ দেখা।

গঙ্গার ধারের পথ দিয়ে আসছি, একটি মেয়ে আমায় ডেকে বললে, একটু এদিকে আসুন, আমার মনিব ঠাকরুণ আপনাকে ডাকছেন।

আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম, কে তার মনিব ঠাকরুণ তাও তো চিনি নে। ভাবলুম, আমায় ব্রাহ্মণ ভেবে মেয়েটি হয় তো গঙ্গাস্নানান্তে দান দেবেন, তাই ডাকছেন। আমি বল্লুম, বাছা, আমি বামুন নই, কায়স্থ। তোমার মনিব ঠাকরুণকে গিয়ে জানাও, আমি তাঁর দানের অপাত্র।

মেয়েটি ছাড়লে না, বললে, তিনি দান নেওয়ার জন্য আপনাকে ডাকছেন না, অন্য কি দরকারে ডাকছেন।

তাকে কিছুতেই ছাড়াতে না পেরে তার সঙ্গে গে ুম, একটি পাশে জনহীন স্থানে একটি রমণী দাঁড়িয়েছিল, মুখে তার অল্প ঘোমটা। আমি গিয়ে দাঁড়াতেই সে গায়ের কাপড়ের নীচে থেকে তার শুভ্র হাত দুখানি বার করে একটা ঠোঙ্গা ভরা কলা সন্দেশ প্রভৃতি আমার পায়ের কাছে রেখে আঁচলটা জড়িয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিলে।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, একি করলেন, আমি ব্রাহ্মণ নই, কায়স্থ।

সে তার মুখের ঘোমটা তুলে ফেললে, শান্ত চোখের দৃষ্টি আমার মুখের 'পরে ফেলে বললে, জানি তুমি বামুন নও কায়স্থ, তোমায় বামুন বলে মনে করে দিই নি, কায়স্থ জেনেই দিয়েছি।

তার মুখের পানে তাকিয়ে আমি চম্‌কে পেছনে সরে গেলুম, রেণু—

কান্নাভরা সুরে প্রৌঢ়া রেণু বললে, হ্যাঁ, আমিই রেণু। আজ চিনতে পারছ কি মহিম দা কিন্তু এক দিন চিনতে পার নি। কতদিন ইচ্ছা হয়েছিল তোমাকে একখানা পত্র লিখি, কিন্তু তোমায় একটা খবর দেওয়ার ইচ্ছাও আমার হয় নি। জীবনের অনেক ভুল শোধরান যায় মহিম-দা, কিন্তু সবগুলোই কি শোধরান দরকার ?

বুকটার মধ্যে ধড়ফড় করছিল, বিকৃত সুরে উত্তর দিলুম, না রেণু, এমন এক একটা ভুল আছে যা করে ফেলে তার প্রায়শ্চিত্ত সারাজীবন ধরে করতে হয়।

রেণু গলা পরিষ্কার করে বললে, হ্যাঁ, তুমি তা করছ সে খবর আমি নিয়েছি, কিন্তু এ প্রায়শ্চিত্ত করার কিছু কারণ ছিল না মহিম-দা, তুমি—

আমি ভারি সুরে বললুম, পেয়ে হারানোর ব্যথা তুমি

বুঝতে পারবে না রেণু, সে ব্যথা যে হারায় সে-ই পেয়ে থাকে। তুমি কোথায় থাক রেণু, তোমার বাড়ীর ঠিকানা কি?

রেণু মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছছিল, শ্লেষ কণ্ঠে বলে উঠল, সে খবরে তোমার কি দরকার?

থতমত খেয়ে গেলুম, না, তোমার স্বামী—

রেণু আবার মুখ ফিরালে,—তিনি নেই, বিয়ের পাঁচ বছর বাদে আমার একটি মেয়ে হওয়ার পরেই তিনি মারা গেছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম, নিজের কর্ত্তব্য তারপর পালন করে গেছ ঠিকমত করেই কি?

সগর্ব্বে গ্রীবা উন্নত করে সে বললে, ঠিকমত করে কি না সে কথা তোমার জানবার দরকার নেই মহিম-দা! যে দিন অতীতে মিশে গেছে তা নিয়ে আমি নাড়াচাড়া করতে চাই নে। তুমি পুরুষ হয়ে তখন যা করতে পেছিয়ে গেলে, তার প্রায়শ্চিত্ত তুমি যে ভাবে করেছ আমায় তার শতগুণ কষ্ট সয়েও করতে হয়েছে এটুকু জেনো। যাক মহিম-দা, সে সব কথা এখন থাক্, বড় ইচ্ছা ছিল—জীবনে আর একদিন যেন তোমার দেখা পাই, ভগবান আমার সে সাধ পূর্ণ করেছেন। এই বাসনা থাকার জন্যে আমি মরণের কোলে কতবার গিয়েও ফিরে এসেছি, এবার আমার ঈপ্সিতকে লাভ করতে পারব, আমার সকল বাসনাই মিটে গেছে।

দিদি-মা গো—

একটি চার পাঁচ বছরের সুন্দর ফুটফুটে শিশু দৌড়ে এসে রেণুকে জড়িয়ে ধরলো। রেণু নীচু হয়ে তার শুভ্র ললাটে একটা চুমো এঁকে দিয়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, কি দাদা, ভয় পেয়েছ ? এঁকে প্রণাম কর, ইনি তোমার দাদা-মশাই হন !

শিশুটি দুই চার বার সন্দিগ্ধ চোখে আমার পানে চেয়ে পায়ের ধূলো নিতে যাওয়া মাত্র আমি তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরলাম, আমার চোখের জল ঝর ঝর করে শিশুর মাথায় ঝরে পড়ল। রেণুও তখন ফিরে দাঁড়িয়ে চোখ মুচ্‌ছিল।

নাতিকে নামিয়ে ঝির কোলে দিয়ে সে আবার আমার পায়ের ধূলো নিয়ে বললে, চললুম, আর দেখা হবে না, এই শেষ।

আমি কথা বলতে গেলুম, পারলুম না। শুনলাম, চলতে চলতে শিশু জিজ্ঞাসা করলো, দিদি, ঠাকুর দেখলে না ?

রেণু উত্তর দিলে আমার ঠাকুর দেখা হয়ে গেছে দাদাভাই, আর দেখতে আসব না।

* * *

* *

রেণুকে দেখতে পেয়ে অন্তরের তরুণ আবার জাগ্রত হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। সে চায় তার—সান্নিধ্য তার সন্দর্শন। তাই দিনের পর দিন ঘড়ির কাঁটার মত হাজির হতাম সেই ঘাটে যেখানে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কিন্তু দিনের পর দিন ব্যর্থতা বুকে নিয়ে ফিরে আসতে হত। কোথায় রেণু, কোথায় সেই ছোট্ট শিশুটি, আর কোথায়ই বা তার ঝি?

একদিন সেই ঝি-টিকে দেখতে পেলুম। তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, এখান হতে ফিরে গিয়েই মা-ঠাকরুণের ব্যারাম হয়েছিল, মাথার না বুকের কি বলে—দশ এগার দিন পরে তিনি মারা গেছেন।

দুই ফোঁটা চোখের জল উপছে পড়ল, লোকান্তরবাসিনীর উদ্দেশ্যে—সে কি নেবে না এ অর্ঘ্য? জীবনের পূজা সারা হয় নি, পূজার সাজ তারও ব্যর্থ পড়ে ছিল, আমারও ব্যর্থ রয়ে গেছে।

আমি ভাবতাম, আমি সমাজদ্রোহী। প্রাচীনের দল আমাকে সহ্য করতে পারতেন না। তরুণের দল আমার অন্তরের বিদ্রোহের ভাষা বুঝতে পারত না। মুখের কথায় তারা যতটুকু প্রেরণা পেত, আমার মন বলত, এতে হবে না। এতে তাদের বুকে আগুন ধরবে, সমাজের ঘন-বনে এর